তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ

গবেষকের নাম : সানজিদা হামিদ
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২৯৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০ (পুনঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারি ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম.ফিল. গবেষক সানজিদা হামিদ (রেজিস্ট্রেশন নং ২৯৭, শিক্ষাবর্ষ: ২০০৯-২০১০ (পুনঃ)) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য আমার তত্ত্বাবধানে "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং গবেষক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

ড. সিদ্দিকা মাহমুদা
প্রফেসর ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
তারিখ:

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

"তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ" শীর্ষক গবেষণাকর্মটি আমার এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ। আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর সিদ্দিকা মাহমুদা। অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ রচনার প্রতিটি পর্যায়ে তিনি আমাকে উদার সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁর প্রাজ্ঞ পরামর্শ, সস্নেহ তাগিদ এবং উৎসাহ দানের কারণে এই অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ এবং ঋণ অপরিশোধ্য।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রন্থ–সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে যাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রফেসর ডক্টর রফিকউল্লাহ খান, প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আজিজুল হক, প্রফেসর ডক্টর গিয়াস শামীম, এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর মুনিরা সুলতানা, আই.ই.আর.-এর এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর জুরানা আজিজ এবং সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান ডক্টর নীলিমা আফরিন। তাঁদের সতর্ক–পরামর্শ এবং সান্নিধ্য আমাকে সমৃদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করেছে।

বাংলাদেশের বাইরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর করুণাসিন্ধু দাস বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রবীন্দ্র-অধ্যাপক' হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে সস্নেহ-সান্নিধ্য, মূল্যবান পরামর্শ এবং প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ প্রদান করে আমাকে ধন্য করেছেন। এ সূত্রে তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

"তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'তারাশঙ্কর এবং রাঢ় বাংলা'। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলা ছোটগল্পের জগতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে লেখকের সঙ্গে রাঢ় বাংলার সম্পৃক্ততা। জন্মসূত্রে এবং অভিজ্ঞতাসূত্রে রাঢ় বাংলার সঙ্গে লেখকের বন্ধন এই পরিচ্ছেদে উন্মোচিত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাঢ় বাংলার লোকজীবনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই অংশে রাঢ় বাংলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং তাদের খাদ্য, পোষাক, পেশা, ধর্ম, সংস্কার-কুসংস্কার, আচার-আচরণ অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনাচরণ তথা সংস্কৃতি উপস্থাপিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'তারাশঙ্করের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ'। এই অধ্যায়েও তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রকাশের কালক্রম অনুসারে নির্বাচিত প্রাসঙ্গিক ছোটগল্প সমূহ বিন্যস্ত করে লোকজীবনের পরিচয় অনুসন্ধান করা হয়েছে।

উপসংহারে সমগ্র গবেষণার একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে সংযুক্ত গ্রন্থপঞ্জিতে 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক গবেষণা-কর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার স্বামী মোঃ জহির-উল ইসলাম এবং আমার বাবা-মা অনেক দায়িত্ব নির্দ্বিধায় পালন করে আমাকে গবেষণাকর্মে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নয়। আমার পুত্র ইশান তার স্বভাব-চাঞ্চল্য দিয়ে আমার মনোবল দৃঢ় এবং সচল রেখেছে সবসময়।

জানুয়ারি ২০১৪ সানজিদা হামিদ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায় ঃ	তারাশঙ্কর এবং রাঢ় বাংলা	১-৬৩
	প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ছোটগল্পের ভুবনে তারাশঙ্কর	২
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রাঢ় বাংলার সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পৃক্ততা	২৫
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রাঢ় বাংলার লোকজীবন	৪০
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	তারাশঙ্করের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ	৬৪-১৩৭
	প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ (১৩৩৪ – ১৩৪৩)	৬৫
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ (১৩৪৪–১৩৫৩)	৯৮
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তৃতীয় পর্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ (১৩৫৩–১৩৭৭)	১২১
উপসংহার		১৩৮
গ্রন্থপঞ্জি		১৪১-১৫০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

তারাশঙ্কর এবং রাঢ় বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছোটগল্পের ভুবনে তারাশঙ্কর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) বাংলা সাহিত্যজগতে এক অবিস্মরণীয় নাম। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি আপন প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়েছেন। বাংলা ছোটগল্পের বলয়ে একজন বলিষ্ঠ লেখক হিসেবে খ্যাতিমান তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ছোটগল্পের জনকই শুধু নন,ছোটগল্পকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন সুদৃঢ় উচ্চতায়। সেই ধারাবাহিকতায় ছোটগল্পের ভুবনে অনেক বিখ্যাত গল্পকার প্রতিভাবলে তাঁদের অবস্থান পাকা করে নিয়েছেন। উনিশ শতকের রেঁনেসাসের প্রভাব যখন সারা বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যে বিস্তৃত, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই প্রভাব বিস্তার লাভ করে পরোক্ষভাবে, ধীরে ধীরে। ঔপনিবেশিক শোষণ এবং শাসন তখন ভারতবর্ষে চলছেÍ এরকম একটা সময়ে বাঙালির মানসজগৎ মুক্তির সন্ধান করছিল। বাঙালি লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এসময় নতুন একটি শিল্পরূপ রচনায় হাত দেন এবং ছোটগল্পের জন্ম হয়। উনিশ শতকের শেষ দশকের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত এবং ছোটগল্প নামকরণটিও তাঁর।

সমগ্র পৃথিবীতে ছোটগল্পের অবয়ব যখন পূর্ণতা পেয়েছে তখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের মাত্র জন্ম হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলো থেকে ছোটগল্প সম্পর্কে দিকনির্দেশক কিছু ধারণা পরবর্তী লেখকদের জন্য পাথেয় হয়। বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন:

> তাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্প মিলে-মিশে সাধারণভাবে ছোটগল্পের যে দেহ-মন-আত্মা, ঘর-বাহির আকাশ রচনা করে, তা উত্তরসূরী বাংলা ছোটগল্পের যথার্থ দিক নির্দেশক হয় নিঃসন্দেহে। তাঁর গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক গভীর-নিবিড় থেকে যে বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করে, সেগুলিকে মোটামুটিভাবে সাজালে দাঁড়ায়: ১. ছোটগল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় হবে একটাই এবং একমুখী। গল্পের অন্যান্য উপকরণ তার প্রতিষ্ঠায় একমাত্র তৎপর হয়। ২. গল্পের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি 'মহামুহূর্ত' থাকবে যেখানে পাঠকের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা স্থির অথচ চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কম্পমান। ৩. একটি প্রধান কাহিনী, একটি প্রধান ঘটনা, একটি প্রধান চরিত্র অন্যান্যদের নিয়ে এমন এক জায়গায় থামবে যেখানে পাঠকের মন থেমেও থেমে যাবে না। তা হল তার উপসংহার, সেখানেই গল্পের মহত্তম ব্যঞ্জনা। শেষ এমন হবে যেন পাঠকের একেবারে মর্মে গিয়ে ঘা মারে। ৪. একাধিক সমালোচক যাকে বলেছেন 'Unity

> of Impressions' অর্থাৎ প্রতীতির সমগ্রতা, তা ছোটগল্পে থাকা প্রয়োজন। ৫.চরিত্রের বাস্তবতা, লেখকের বক্তব্য ও শিক্ষা জীবনের বৃহত্তম সত্যকে তুলে ধরবে। [১]

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গল্পগুলো ছিল গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত, ধীরে ধীরে কালের দাবিতে শহরের পটভূমিতে তিনি গল্প রচনা করেন। তখন বাংলা ছোটগল্পে যোগ হল নতুনত্ব, ভিন্ন মাত্রায় সেজে উঠল বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডার। মানবহৃদয়ের বিচিত্র টানাপোড়েন, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা ছাড়াও রাজনীতি, বিজ্ঞান চিন্তা, যুক্তির উর্ধ্বে অতিপ্রাকৃত বিষয়Í এসবই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের উপকরণ হয়েছে এবং নিজের সৃষ্টিকে বার বার নিজেই অতিক্রম করে তিনি নতুন নতুন কাঠামোতে ছোটগল্পকে ধারণ করেছেন। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'নষ্টনীড়', 'সমাপ্তি', 'শাস্তি', 'একরাত্রি', 'রবিবার', 'স্ত্রীর পত্র', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য গল্প। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৬) রবীন্দ্রনাথের কিছু পরের ছোটগল্পকার। গার্হস্থ্য জীবনের সাধারণত্ব তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের পরে ছোটগল্প লিখলেও তিনি রবীন্দ্র–ঘরানারই একজন। গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র, দাম্পত্য-প্রেম খুনসুটি, মানবতা, সমাজসমস্যা ইত্যাদি তাঁর ছোটগল্পের বিষয় হয়েছে। 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ,' 'বিলাসী' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প।

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে বেরিয়ে আসার জন্য নতুন একদল লেখকের আবির্ভাব হল। তাঁকে অবজ্ঞা বা হেয় করে নয়, রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে অন্য কিছু পাঠককে দেওয়ার জন্য তাঁরা 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকা প্রকাশ করলেন। সেই সময়টাও ছিল অস্থির, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভগ্ন সমাজব্যবস্থা চিন্তা চেতনায় আলোড়ন তোলে। অসম্পূর্ণতা, অসহিষ্ণুতা, অনিশ্চয়তা নতুন লেখকদের লেখার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে বেরিয়ে আসা তখন ছিল সময়েরই দাবি। প্রত্যক্ষভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত বা অভিঘাত ভারতবর্ষে না লাগলেও যুদ্ধজনিত অভিশাপ ঠিকই ভারতবর্ষের চাকরির বাজারে, ব্যবসার বাজারে প্রভাব ফেলেছে। ফলস্বরূপ বেকার সমস্যা, আর্থিক সংকট, নীতিহীনতা বাঙালিকে ক্ষতবিক্ষত করেছে অহরহ।

অন্যদিকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী, লেখককে অনুপ্রাণিত করল রুশ বিপ্লব (১৯১৭)। বিভিন্ন বিদেশী ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ করে নিজেদের মেধার সীমানাকে বিস্তৃত করে তুললেন তাঁরা। রুশ লেখক দস্তয়ভ্স্কি, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, গোর্কি— এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছোটগল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন নব্য লেখকেরা। নানা মাত্রিক চিন্তা চেতনায় বৃদ্ধি পেল ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য। মার্কসবাদী চিন্তা,

ফ্রয়েডিজম সরাসরি প্রভাবিত করল ছোটগল্পকারদের; বিশ্বজনীনতা ঠাঁই পেল ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। তরুণ লেখকদের চিন্তা ভাবনায় অবধারিতভাবে মোপাঁসা, লরেন্স, জোলা, রোমা রোঁলার প্রভাব এসে পড়ল। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি'Í কেন্দ্রিক এই নতুন লেখকদল যাঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে বেরিয়ে এসে অন্য একটি ধারা গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) প্রমুখ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) লেখকেরা 'কল্লোল'-এর থেকে ভিন্নরকম একটি আমেজ নিয়ে এসেছিলেন ছোটগল্পের জগতে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবি-স্বভাব তাঁর গল্পকার সত্তাকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের শূন্যতাকে তিনি ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেছেন। রোমান্টিকতার পাশাপাশি রূঢ় বাস্তবতাও তাঁর সাহিত্যে সমানভাবে বিদ্যমান। যুদ্ধোত্তরকালের হতাশাগ্রস্ত তরুণদের অচিন্ত্যকুমার তাঁর ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক সংকটও তাঁর লেখনীতে বাস্তবসম্মত রূপ লাভ করেছে। 'সারেঙ', 'ধন্বন্তরি', 'দুইবার রাজা', 'ইতি' প্রভৃতি গল্প অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অসাধারণ সৃষ্টি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ভাবগত, আদর্শগত দুই অর্থেই কল্লোলীয়। যুগের অস্থিরতা-অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে কল্লোলের লেখকগণ লেখনী ধরেছিলেন। সমাজে অস্থিরতা থাকলেও, সাহিত্যে জীবনের স্থির একটা কেন্দ্রকে ধরতে উৎসাহী ছিলেন তিনি। তিনি মূলত নগরবাসীর জীবন তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। সমকালীন জীবনের কদর্যতা, হিংসা, লোলুপতা, বৈকল্য সবই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গল্পে। প্রেমেন্দ্র মিত্র মনোবিকলনের রূপকার, অবশ্য তাঁর গল্পে সুস্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষাও আমরা পাই। 'শুধু কেরাণী' গল্পে আর্থিকভাবে অসচ্ছল এক দম্পতিকে দেখা যায় বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে। সমকালীন অবক্ষয়, নীতিহীনতা মানবতাকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছিল, সেই বিকলাঙ্গ মানসিকতাকে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্পে বিভিন্ন রূপে তুলে ধরেছেন। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সংসার সীমান্তে', 'ভবিষ্যতের ভার', 'পুন্নাম' প্রভৃতি গল্প পাঠকের প্রচলিত মূল্যবোধকে নাড়া দিয়ে যায়।

শৈলজানন্দ 'কয়লাকুঠি' রচনা করে ছোটগল্পের বিষয় পরিধিতে বাড়তি মাত্রা যোগ করলেন। শ্রমিক শ্রেণীর নিম্নস্তরের জীবনও শিল্পিত হয়ে ছোটগল্পের বৈচিত্র্য বাড়াতে পারে তা শৈলজানন্দই সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যৌনকামনা, ভোগলিপ্সা তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন

অবলীলায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পেও এসব বিষয় এসেছে তবে তা লেখকের স্বকীয়তামণ্ডিত। 'কাঠ খড় কেরোসিন', 'দুই বার রাজা', 'ধন্বন্তরি', 'সারেঙ', 'যে কে সে', ইত্যাদি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের শিল্পিত ছোটগল্প। বুদ্ধদেব বসুও দেহজ কামনা-বাসনা, মানব-বিকলন, হতাশা, অবক্ষয়, তথাকথিত ভদ্রসমাজ যাদের দেখে নাক সিটকায় সেই পড়ে থাকা, পঁচে থাকা অন্ত্যজ শ্রেণীকে তাঁর ছোটগল্পের বিষয় করেছেন। 'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পে বুদ্ধদেব বসু তৎকালীন সমাজের সম্পর্কের অবক্ষয় এবং তার ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন। কাব্যানুভূতি তাঁর ছোটগল্পকে ঘিরে রেখেছে বেশিরভাগ সময়। 'আমরা তিনজন', 'হতাশা', 'অসমাপ্ত', 'রেখাচিত্র', ইত্যাদি গল্পে সেই মানসিকতার পরিচায়ক।

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩) কল্লোলের কালের আরেক নবীন গল্পকার। তাঁর নাগরিক জীবনভাবনার সঙ্গে বোহেমিয়ান মানসিকতাও যুক্ত। রোমান্টিকতা, যাযাবর মানসিকতা, আবেগÍ এই তিন মিলেই তাঁর গল্পকার-সত্তা। 'গুহায় নিহিত', 'অন্ধ', 'বনমানুষের হাড়', 'নিশিপদ্ম', ইত্যাদি প্রবোধকুমারের বিখ্যাত গল্প। 'নিশিপদ্ম', 'বনমানুষের হাড়', ইত্যাদি গল্পে বিশ্বযুদ্ধোত্তর অনিকেত চেতনা থাকলেও তা না-বোধক হয়ে সব রচনায় ধরা পড়েনি। জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) কল্লোলের মূল ভাব গ্রহণ করে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছেন। সুযোগসন্ধানী, স্বার্থ-সর্বস্ব মানুষকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে উপস্থাপন এবং মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষাকে নির্মোহ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন গল্পকার। তিনি জীবনের পঙ্কিলতাকে তাঁর রচনায় অতি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। যৌনতার পঙ্কিলতা, মানবমনের পঙ্কিলতা, সম্পর্কের পঙ্কিলতা জগদীশ গুপ্ত নির্বিকারভাবে উপস্থাপন করেছেন পাঠকের সামনে। 'পয়োমুখম', 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী', 'দিবসের শেষে', 'পেয়িংগেস্ট' প্রভৃতি ছোটগল্প পাঠককে এক ভিন্ন স্বাদ এনে দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনস্তত্ত্ব, বিকারগ্রস্ততা, যৌনতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁর গল্পগুলোকে অন্যরকম স্বাদ এনে দেয়। 'হলুদ পোড়া', 'কুষ্ঠ রোগীর বউ', 'সরীসৃপ', 'প্রাগৈতিহাসিক' প্রভৃতি গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য, আঙ্গিক, পরিচর্যারীতি সবই নতুন ধরনের। ফ্রয়েডিজম তাঁর ছোটগল্পকে করেছে সমৃদ্ধ, বিজ্ঞানবোধ তাঁর ভাষাকে করেছে ধারালো এবং মার্কসবাদ তাঁর বিষয়বৈচিত্র্যের আরেকটি ধারা হিসেবে প্রবাহিত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৮০) ছোটগল্পের জগতে প্রথাবিরোধী গল্পকার হিসেবে পরিচিত। সমাজবাদী বাস্তবচেতনা এবং ইতিহাসচেতনার ক্রমবর্ধমান রূপ তিনি তাঁর ছোটগল্পে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের সমকালে তিনি লিখেছেন, যার ফলে তৎকালীন জীবনচেতনা তাঁর গল্পে উপস্থিত। বিশ্বযুদ্ধকালীন সমাজের অবক্ষয়িত রূপ, সমাজের তথাকথিত ভদ্র মানুষদের ভণ্ডামি, ভীরুতা, নিচতা, প্রতারণা, পলায়নী মনোবৃত্তি, বর্ণাভিমান, মিথ্যাচার, সম্পদের প্রতি লোভ, কুসংস্কার, দৈবভক্তি, নারী লালসা শিল্পিতভাবে সুবোধ ঘোষের গল্পে উঠে এসেছে। 'গোত্রান্তর', 'ফসিল', 'সুন্দরম', 'অযান্ত্রিক', 'বারবধূ', 'জতুগৃহ', 'শিবালয়' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গল্প।

কল্লোলের কালের লেখকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারেই ভিন্ন চিন্তাধারা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি হতাশা, অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা, যৌনতার বাড়াবাড়ি, যৌনতার বিকৃতি এসব বিষয়কে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। যখন তাঁর সমকালের অন্যান্য লেখকগণ কালের অবক্ষয় আর হতাশা তুলে ধরতে ব্যস্ত, সেই সময়ে তিনি নিয়ে এলেন স্নিগ্ধ প্রকৃতির সান্নিধ্য। 'পুঁইমাচা', 'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল', 'কিন্নরদল', 'জন্ম ও মৃত্যু' প্রভৃতি গল্পে প্রকৃতি অন্যরকম আমেজে পাঠককে মুগ্ধ করে। তাঁর গল্পে দারিদ্র্য এসেছে কিন্তু এজন্য মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়নি। আধ্যাত্মিক জগৎ, মানুষ আর প্রকৃতি এই তিন মিলেই বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের জগৎ তৈরি হয়েছে।

বিশ শতকের তিনের দশকে তারাশঙ্করের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের জগতে। এসময় নতুন নতুন ভাবনায় স্পন্দিত হচ্ছিল গোটা ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে নতুন জীবনবোধ এদেশের চিত্তমূলে নাড়া দিয়েছে গোটা শতক জুড়েই। ভারতীয় জীবনভাবনায় পাশ্চাত্য জীবনভাবনার প্রভাব প্রত্যক্ষ ভাবে তখন পড়তে শুরু করেছে। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষ, ১৯১৪-১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ, ১৯২১ সালে গান্ধী যুগের সূচনা, ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগÍ এইসব ঘটনা জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। বিশ্বযুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের কারণে সমাজে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তার ফলে মানুষ মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। কালোবাজারি, প্রবঞ্চনা মানুষকে অসৎ পথে ঠেলে দেয়। বহু আকাঙ্ক্ষিত দেশ–বিভাগজাত স্বাধীনতা সমাজ জীবনে আশাব্যঞ্জক কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এই রকম একটা সময়ে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক হিসেবে আবির্ভাব। পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যরচনা শুরু করেছিলেন আটাশ বৎসর বয়স থেকে। লাভপুর থেকে প্রকাশিত 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় তিনি গল্প, কবিতা, সমালোচনা, সম্পাদকীয় সহ সব রকম রচনা লিখতেন। তাঁর মানসজগতে সেকাল-একাল দুই কালের জীবনবোধই ক্রিয়াশীল ছিল। ডঃ সমরেন্দ্রনাথ মল্লিকের বক্তব্য :

> এই সমকাল আমাদের জীবনের সঙ্গে সুগ্রথিত। এর গুরুত্ব আমরা বুঝি। প্রেক্ষাপট সুপরিচিত। এই সমকালের মানুষ তারাশঙ্কর। জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। আরও একটু নিশ্চিত করে বললে শেষ দশকের শেষ পর্বে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত হয়েছেন ঐ পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে। তাই, বিংশ শতাব্দীর পটভূমির পেছনে তাঁর মানসিক প্রস্তুতির আরও একটা পটভূমি রয়েছেÍ সেটা ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনবোধ। ১৮৯৮ এর ২৩ শে জুলাই থেকে ১৯৭১ এর ১৪ই সেপ্টেম্বরÍ এই জীবন কালের সীমায় বিংশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবুও তারাশঙ্করের উপলব্ধিতে এর কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। [২]

এই ব্যতিক্রম হল সেকাল আর একালের সহাবস্থান। তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলোতে দুই কালের দ্বন্দ্ব নেই। দুটি কাল দুটি ধারার মতো সমান্তরালভাবে তাঁর ছোটগল্পের আধার হয়েছে। একালে বসে পাঠকদের কাছে তিনি সেকালের সমাজ পরিবেশের মানুষের ভিন্নরূপ তুলে ধরেছেন। ক্ষীয়মান জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে বংশগতভাবে যুক্ত থাকার কারণে জমিদার শ্রেণীর পড়তি অবস্থা তাঁর ছোটগল্পে দেখা যায়। জমিদারতন্ত্রের অভিজ্ঞতা, স্বদেশীভাবনাজাত-রাজনীতি, বীরভূমের লাভপুর গ্রামের জীবন এই তিন মিলেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের জগত গড়ে উঠেছে। 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় 'কামন্দক' ছদ্মনামে তারাশঙ্কর 'মুকুন্দের মজলিস' এবং অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। 'পূর্ণিমা-য়' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প 'স্রোতের কুটো' প্রকাশিত হয়। এরপর বিখ্যাত 'রসকলি' গল্পটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপার জন্য দিলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তা না পড়েই ফিরিয়ে দেয়। অপমানিত তারাশঙ্কর সেই সময় সাহিত্য সাধনা ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে দেশে ফিরে 'কল্লোল' পত্রিকাতে 'রসকলি' পাঠালে তা সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং ছাপা হয়। 'কালিকলম', উপাসনা' পত্রিকাতেও তিনি লিখতেন। 'কল্লোল'-এ তাঁর আরও কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পরই রাজনৈতিক কারণে তাঁকে কারাগারে যেতে হয়। আদ্যান্ত রাজনীতিসচেতন তারাশঙ্কর সহিংস বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে। ১৯৩০ সালে যখন আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হল গ্রেপ্তার হলেন তিনি।

১৯৩০ সালে ছ'মাসের কারাবরণ শেষে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা করে তিনি বেছে নেন সাহিত্যসেবার মাধ্যমে দেশসেবার পথ। বোলপুরে পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রেস চালু করলেন তিনি। কিন্তু এক বিদ্রোহী কংগ্রেস কর্মীর জেলা প্রশাসককে নিয়ে রচিত ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা প্রেস থেকে ছাপা হলে সেই জেলা প্রশাসক জামানত দাবি করেন। তারাশঙ্কর প্রেসটি বন্ধ করে দেন এবং কলকাতায়

চলে আসেন। তখন তাঁর 'শ্মশানের পথে ' গল্পটি 'কালিকলম' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি পরবর্তীতে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর 'উপাসনা' পত্রিকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তারাশঙ্কর দুই পুত্র এবং তিন কন্যার পিতা ছিলেন। সন্ধ্যা নামে তার মেয়েটি ছ'বছর বয়সে মারা গেলে দারিদ্র্য আর সন্তান হারানোর বেদনা দুটোই এলোমেলো করে দিল তাঁর চিন্তাজগৎ। 'সন্ধ্যামণি' গল্পটি কন্যাহারা শোকার্ত পিতার রচনা। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় এই গল্পটি 'শ্মশানঘাট' নামে পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় আঠারো উনিশটি গল্প প্রকাশের পর তারাশঙ্করের মনে হল শ্মশানের আগুন তাঁর চিন্তা জগতকে নতুন দিকে মোড় ঘুড়িয়ে দিল।

সাহিত্য সমালোচক শান্তনু পাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের সূচনা প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় বিবেচনা করেছেন:

> সূত্রাকারে বিষয়টিকে ক্রমান্বয়ে এভাবে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে:
> সূত্র, এক, গ্রাহকমূল্য স্বীকৃত 'রসকলি' (কল্লোল, ফাল্গুন ১৩৩৪)–র প্রথম প্রকাশ;
> সূত্র, দুই, গ্রাহকমূল্য বর্জিত 'হারানো সুর' (কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩৫)–এর প্রকাশ এবং সাহিত্যিক জীবনের কাল-গণনার সূচনা এবং
> সূত্র, তিন, কারাপ্রাচীরের অন্ধকার থেকে অর্গলমুক্ত আলোকময় জীবনলাভ (অগ্রহায়ণ ১৩৩৭) ও এই সময় থেকেই সাহিত্য জীবনের কাল-গণনার সূচনা।
> এই তিনটি সূত্র থেকে তারাশঙ্করের সংশয় বিজড়িত তিন ভিন্ন মানসিকতা স্পষ্ট হয়। প্রথমত, সাহিত্যিক জীবনের কাল-গণনা নিয়ে দুই বিপরীত মন্তব্য: একটিতে (সূত্র, দুই) রয়েছে গ্রাহকমূল্যহীন আর্থিক মুকুবজনিত নির্ভার মুক্ত চিন্তার শিল্পপ্রয়াস; দ্বিতীয়টিতে (সূত্র, তিন) রয়েছে জেলের অন্ধকার বৃত্ত থেকে আলোকোজ্জ্বল স্বাধীন ও মুক্ত জীবনলোভে লেখকের শিল্পীত প্রয়াস। এছাড়া প্রথম সূত্রে (সূত্র, এক) অর্থসম্পর্কযুক্ত শিল্প প্রকাশে শিল্পী কাল–গণনায় অনিচ্ছুক; দ্বিতীয় সূত্রে গ্রাহক মূল্যের অর্থমুকুবজনিত গ্লানিহীন শৈল্পিক এষণা এবং তৃতীয় সূত্রে রয়েছে শিল্পীর বন্ধনমুক্ত অসহিষ্ণু মনের অবাধ পদসঞ্চার। [৩]

'মুকুন্দের মজলিস' (অগ্রহায়ন ১৩৩৩) তারাশঙ্করের সূচনা-গল্প এবং 'আনন্দবাজার' এর ১৩৭৭ এর পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত 'সখী ঠাকরুন' তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গল্প। অর্থাৎ সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর জুড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। এই দীর্ঘ পর্বের শুরুতে লেখক অতিক্রম করেছেন দুঃখ-বেদনা জর্জরিত অনেকটা সময়, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে অবহেলা অবজ্ঞা হয়রানি

এসবকে পেছনে ফেলে তারাশঙ্কর এগিয়ে যেতে থাকেন। জীবিকা হিসেবে সাহিত্যকে বেছে নেবেন কি নেবেন না সেটা নিয়েও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহিত্যেই স্থির হলেন এবং বালিগঞ্জে এসে বসবাস শুরু করলেন। ততদিনে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত তারাশঙ্করের দ্বিতীয় গল্প 'মেলা', 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'ডাইনীর বাঁশী' সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে প্রিয় হয়ে উঠেছে। তার কিছুদিন পরে 'নারী ও নাগিনী' 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ছাপা হলে জনপ্রিয়তা, প্রশংসা দুটোই পায়। কিছু গল্প জনপ্রিয়তা পেলেও আর্থিক কষ্ট তখনও তাঁকে ছেড়ে যায়নি।

মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) প্রশংসামূলক সমালোচনা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান-ক্ষোভ-বঞ্চনার দুনিয়া থেকে মুক্তি দেয়। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার 'শ্মশানঘাট', 'প্রবাসী' পত্রিকার 'ঘাসের ফুল' এবং 'রসকলি', 'জলসাঘর' ও 'ছলনাময়ী' গল্প-সংকলন তিনটি পাঠ করে মুগ্ধ হন মোহিতলাল মজুমদার। নিতাই বসু মোহিতলালের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন :

> গল্প লেখকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান কে , এই প্রশ্নের উত্থাপন ও তাহার সমাধান করিতে হইলে তারাশঙ্করের কৃতিত্ব যেরূপ উত্তরোত্তর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার দাবিই গ্রাহ্য হইতে পারে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার দুঃসাহস আমি করিতেছি। মোহিতলাল আরও বললেন, 'বস্তুর বাস্তবতাকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহার রসরূপ আবিষ্কার করায় যে কবি-মনোভাব, তাহার একটি অভিনব মৌলিক ভঙ্গী তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। [৪]

লাভপুর দলের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে তারাশঙ্কর একটি পল্লীকর্মী সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। সেই সম্মেলনের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রথম সাক্ষাৎ, দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৩৪৩ সালের চৈত্রমাসে। তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নতুন বই 'রাইকমল' ও 'ছলনাময়ী' পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর মতামতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ 'রাইকমল'-এর প্রশংসা করে চিঠি লিখেছেনÍ "কল্যাণীয়েষু, তোমার বইখানি পড়ে খুশি হয়েছি। 'রাইকমল' গল্পটির রচনায় রস আছে এবং জোর আছেÍ তাছাড়া এটি ষোল আনা গল্প, এতে ভেজাল কিছু নেই। পাত্রদের ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেল সেটি গড়ে তোলা সহজ নয়। " [৫]

'ছলনাময়ী' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ পরে পাঠ করবে বলে তিনি তারাশঙ্করকে জানিয়েছিলেন। সমসাময়িক অনেকে তাঁর লেখাকে স্থূল বলে সমালোচনা করলে এই বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতামত চান। ১৩৪৩ সালের ২৮ ফাল্গুন তিনি রবীন্দ্রনাথের চিঠি পান এবং রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠি লিখেছেন:

> তোমার স্থূল দৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্মস্পর্শ আছে, আর তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয়। তাতে বাস্তবতার কোমরবাঁধা ভান নেই, গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি। [৬]

রবীন্দ্রনাথের আশাব্যঞ্জক কথাগুলো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নতুন এক আত্মপ্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত করে তোলে। সন্ধ্যা নামের কন্যাসন্তানের মৃত্যুর পর তারাশঙ্কর জগৎ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাসূচক কথাবার্তায় তিনি যেন দিশা খুঁজে পেলেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় হয়, ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। তাঁর 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পটি 'রাইকমল' গল্পগ্রন্থে ছিল এবং এটি রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লেগেছিল। লাভপুর গ্রামের একজন গন্ধবণিকের সন্তানহীনা বিধবা মেয়ে যার নাম স্বর্ণ তাকে অবলম্বন করে এই অসাধারণ গল্পটি লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথকে একবার একজন সাহিত্যসমালোচক-পণ্ডিত বলেছিলেন যে, ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে ধার করে উইচক্রাফট নিয়ে হয়তো লেখক এই গল্পটি লিখেছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের প্রতি একধরনের বিশ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথ এর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, "এ তারাশঙ্করের দেখা ডাইনী, সে তাকে দেখেছে।" [৭] তারাশঙ্করও জোর দিয়ে বললেনÍ "ও আমার দেখা। আর আমি তো ইংরিজী ভালো জানিনা, আমার গ্রামে ইংরিজী বই পড়ারও সুযোগ নেই, স্বর্ণ ডাইনী আমাদের বাইরের বাড়ীর পুকুরের ওপারে থাকত। তাকে আমি দেখেছি।" [৮]

'ছলনাময়ী', 'মেলা', 'ডাইনীর বাঁশী', 'ঘাসের ফুল', 'ব্যাধি' ও 'মুখুজ্জে মহাশয়' গল্পগুলো নিয়ে ১৩৪৩ সালের বাংলা নববর্ষে 'ছলনাময়ী' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণে 'সন্ধ্যামণি', 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'খড়্গ' ও 'রঙীন চশমা' এই চারটি গল্প যুক্ত হয়েছিল। ১৩৪৪ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হল 'জলসাঘর' গল্পগ্রন্থ। 'জলসাঘর', 'পদ্মবউ', 'ডাক-হরকরা', 'প্রতীক্ষা', 'মধুমাস্টার', 'তারিণী মাঝি', 'খাজাঞ্চীবাবু', 'টহলদার', 'ট্যারা', 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে', 'নারী ও নাগিনী' এই এগারোটি গল্প এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৪৪ সালেই তিনি বাসাবদল করে শান্তিভবন বোর্ডিং

এ এসে উঠেছেন। তখন তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সাত আর প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা পঁচাত্তর। এই বোর্ডিং-এ এসে সাহিত্যসাধনার উপযোগী পরিবেশ পেয়ে বেশ তৃপ্তি বোধ করলেন। ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাসে 'কালাপাহাড়', 'তাসের ঘর', 'মতিলাল', 'মুসাফিরখানা', 'শ্মশান-বৈরাগ্য', 'নুটু মোক্তারের সওয়াল', 'অগ্রদানী', 'প্রতিমা', ও 'রসকলি'Í এই নয়টি গল্প নিয়ে 'রসকলি' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৩৪৫ সালের আষাঢ় মাসে 'পরিচয় ' পত্রিকার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) অনুরোধে 'মা' গল্পটি প্রকাশ করেন যা পরবর্তীতে 'ফল্গু' নামে 'যাদুকরী ' গল্প সংকলনে যুক্ত হয়।

জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন গল্পে স্থান দিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন তিনি। 'ভ্রমণ কাহিনী' গল্পটি রচনা করেছিলেন পাটনা যাবার পথে জংশনে দেখা একজন দেহাতি মানুষকে নিয়ে। 'প্রতিধ্বনি' গল্পটি লিখেছিলেন এক পাগলকে নিয়ে যে কালীসাধনা করতে গিয়ে শবাসনে বসে মানসিক ভারসাম্য হারান, যার সঙ্গে কবির পরিচয় হয়েছিল পাটনায় গিয়ে। পূজার সময় তারাশঙ্কর 'ট্রিটি', 'সুখনীড়', 'চোরের মা', 'পিতাপুত্র' ও 'বেদেনী'Í এই পাঁচটি গল্প লিখেছিলেন। একটার পর একটা গল্প তখন তিনি রচনা করে যাচ্ছেন, পাঠকের সামনে ছোটগল্পের ভাণ্ডার সাজিয়ে যাচ্ছেন সযতনে। 'বন্দিনী কমলা', 'রাঙাদিদি', 'দিল্লীকা লাড্ডু', 'দেশে', 'চন্দ্রজামাইয়ের জীবনকথা', 'পিঞ্জর', 'চোরের পুণ্য', 'একরাত্রি' ইত্যাদি অসাধারণ ছোটগল্পগুলো বাংলা সাহিত্যজগতকে সমৃদ্ধ করে তুলছে। ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে 'একরাত্রি', 'চন্দ্রজামাইয়ের জীবনকথা', 'সুখনীড়', 'পিঞ্জর', 'মালাকার', 'কাঁটা', 'বন্দিনী কমলা', 'চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস', 'চারহাটির ষ্টেশনমাষ্টার', 'সংসার' ও 'তিন শূন্য' – এই এগারোটি গল্প নিয়ে 'তিন শূন্য' গল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘ গড়ে তুললেন এবং তৃতীয় বছরে (১৯৪২-১৯৪৩) এই সংঘের সভাপতি হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর যখন সভাপতি ছিলেন সেই সময়ে বাংলায় নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি এই সময়েই প্রকাশিত হয়। ১৩৪৯ সালের চৈত্র মাসে 'প্রতিধ্বনি', 'রাজা-রাণী ও প্রজা','বড় বৌ', 'রাজপুত্র', 'হরিপণ্ডিতের কাহিনী', 'পুরোহিত', 'রাণুর বিবাহ', ও 'সন্তান' এই গল্পগুলো নিয়ে 'প্রতিধ্বনি' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং ১৩৫০ সালের আশ্বিনে 'বেদেনী' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যেখানে 'বেদেনী', 'পিতাপুত্র', 'ইতিহাস', 'রাধারাণী', 'ডাইনী', 'বাণী মা',' হোলি', 'চোরের মা', 'চোর' ও 'না' গল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'তারিণী মাঝি', 'তিন শূন্য' গল্প দুটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পটভূমিতে রচিত। ময়ূরাক্ষীর বন্যার প্রলয়ঙ্করী রূপ নিয়ে 'তারিণী মাঝি' রচিত আর দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত 'তিন শূন্য' গল্পটি । তখন বীরভূমে অনাবৃষ্টিতে মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল। ধীরে ধীরে লেখকের লেখার পরিধি বাড়তে থাকে। ১৩৫০ সালে কার্তিক মাসে 'দিল্লীকা লাড্ডু', ফাল্গুন মাসে 'যাদুকরী' ও 'স্থলপদ্ম' এই তিনটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। 'দিল্লীকা লাড্ডু' তে সাতটি গল্প স্থান পায়, যথাÍ 'দিল্লীকা লাড্ডু', 'পঞ্চরুদ্র', 'ট্রিট্রি', 'মাছের কাটা', 'এ্যাও', 'আধলা ও পয়সা' এবং 'ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান'। 'যাদুকরী' গ্রন্থে সংকলিত হয় 'যাদুকরী', 'শ্রীনাথ ডাক্তার', 'জায়া', 'ভ্রমণ কাহিনী', 'ফল্গু', 'তপোভঙ্গ', 'প্রত্যাবর্তন', 'বাউল', 'শ্যামাদাসের মৃত্যু' ও 'সনাতন' এই দশটি গল্প নিয়ে। 'স্থলপদ্ম' গল্পসংকলনে 'স্থলপদ্ম', 'চব্বিশে ডিসেম্বর', 'আলো আঁধারি', 'ময়দানব', 'রাঠোর ও চন্দাবত', 'মরামাটি' ও 'অহেতুক' এই সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে। তারাশঙ্কর দশম গল্পগ্রন্থ '১৩৫০' গান্ধীজীকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই গ্রন্থের চারটি গল্প 'বোবাকালা', 'পৌষ-লক্ষ্মী', 'শেষ কথা' ও 'আখেরী' তে লেখকের শিল্পিমানসের সময় ও সমাজসচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩৫২ সালে 'বসুমতীর' নববর্ষ সংখ্যায় 'তমসা' নামের গল্পটি প্রকাশিত হয় যা তারাশঙ্করকে গল্পকার হিসেবে খ্যাতির চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিল। একই বছরের শারদীয় 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হল 'ইমারত' এবং চৈত্রে 'দিগন্তে' মুদ্রিত হল 'শর্বরী' গল্পটি। ১৩৫২ সালের শ্রাবণ মাসে 'প্রসাদমালা', 'সুরতহাল রিপোর্ট', 'দেবতার ব্যাধি', 'কুশপুত্তলী', 'সর্বনাশী এলোকেশী ' ও 'ইস্কাপন' এই ছয়টি গল্প নিয়ে 'প্রসাদমালা' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একই বছরের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয় 'হারানো সুর' গল্পগ্রন্থ যেখানে 'হারানো সুর', 'শাপমোচন', 'পুত্রেষ্টি' 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার', 'কুলীনের মেয়ে', 'ব্যাঘ্রচর্ম' 'চৌকিদার' ও 'জুয়াড়ী' এই আটটি গল্প স্থান পেয়েছে।

এই সময়ের অনতিকাল পরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীরের প্রতি বেখেয়াল ছিলেন বলে নানা রকম রোগ তাঁর শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল। অসুস্থতা ছাড়াও তাঁর শিল্পিসত্তা নাস্তিকতা আর বিজ্ঞানবাদী চিন্তার সংঘর্ষে নতুন রূপ নিচ্ছিল কিন্তু নাস্তিক্যবাদ ও আস্তি-ক্যবাদের দ্বন্দ্ব তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করছিল। তবে পরিমিত শিল্পবোধ নিয়ে তিনি সৃষ্টিশীল ছিলেন। ১৩৫৩ সালেই আবার 'ইমারত' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ছয়টি গল্প নিয়ে। এই ছয়টি গল্প হল 'ইমারত', 'নারী', 'তৃষ্ণা', 'আরোগ্য', 'তমসা' ও 'শর্বরী'। ১৩৫৪ সালের বৈশাখ মাসে 'রামধনু', 'কালাপাহাড়', 'নুটু মোক্তারের সওয়াল', 'ব্যাধি', 'খাজাঞ্চীবাবু', 'ডাক-হরকরা' ও 'শেষকথা'Í এই সাতটি গল্প নিয়ে 'রামধনু' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৩৫৪ সালের মাঘ মাসে 'শ্রীপঞ্চমী' নামে

গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হল পাঁচটি গল্প নিয়েÍ 'সত্যপ্রিয়ের কাহিনী', 'ধার্মিকের পরীক্ষা', 'বিধাতা ও মানুষ', 'কাকপণ্ডিত' ও 'স্বাধীনতা'। ১৩৫৫ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'কামধেনু' গল্পগ্রন্থের গল্প সংখ্যা পাঁচÍ 'কামধেনু', 'যাদুকরের মৃত্যু', 'পাটনী', 'বরমলাগের মাঠ', 'কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি'। ১৩৫৭ সালের কার্তিক মাসে 'মাটি', 'ময়দান', 'বেদের মেয়ে', 'নব মহাপ্রস্থান উপাখ্যান', 'গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী' ও 'সাবিত্রী চুড়ি' এই ছ'টি গল্প নিয়ে 'মাটি' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

এরপর ১৯৪৭ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর 'হাসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার' দান করে সম্মানিত করেন। লেখক হিসেবে তারাশঙ্করের খ্যাতি তখন বিদগ্ধসাহিত্য-রসিকদের মাঝে। ১৩৫৮ সালের মাঘ মাসে 'শিলাসন' নামে তাঁর নতুন গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'শিলাসন', 'কান্না', 'প্রহ্লাদের কালী'Í এই তিনটি গল্প নিয়ে। ১৩৬২ সালে 'একটি মুহূর্ত', 'জটায়ু', 'বিস্ফোরণ', 'কালো মেয়ে', 'বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাহিনী', 'গবিন সিংয়ের ঘোড়া' এবং 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলী'Í এই সাতটি গল্প সহ 'বিস্ফোরণ' নামে প্রকাশিত হয়। ১৩৬৩ সালে ভাদ্র মাসে 'ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প' গ্রন্থে 'সত্যপ্রিয়ের কাহিনী', 'বিচিত্র কাহিনী', 'জটায়ু', 'কাক পণ্ডিত', 'গবিন সিংয়ের ঘোড়া' ও 'মধুমাস্টার'Í এই ছয়টি গল্প সংকলিত হয়। ১৩৬৪ সালে নতুন পাঁচটি গল্পÍ 'বিষপাথর', 'রবিবারের আসর', 'হেডমাস্টার', 'বাবুরামের বাবুয়া', 'হৈমবতীর প্রত্যাবর্তন' নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'বিষপাথর' গল্প সংকলন।

১৯৬২ সালে ভারত সরকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দান করেন। উচ্চ রক্তচাপের কারণে শারীরিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি কিন্তু তাঁর সৃষ্টি থেমে যায়নি; উপন্যাস, গল্প রচনা করে চলেছেন তিনি। ১৩৬৭ সালের শ্রাবণ মাসে 'ইস্কাপন' ও 'বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা' গল্প দুইটি পূর্বের প্রকাশিত গ্রন্থ '১৩৫০'এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'পৌষ-লক্ষ্মী' নামে মুদ্রিত হয়। ১৩৬৮ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত 'চিরন্তনী' নামে গল্প সংকলনের আটটি গল্প হলÍ 'রাণুর বিবাহ', 'তাসের ঘর', 'জায়া', 'বড় বৌ', 'প্রতিমা', 'প্রত্যাবর্তন', 'শিলাসন' ও 'তমসা'। ১৩৬৮ সালেই 'অ্যাকসিডেন্ট', 'কয়েক ফোঁটা রক্ত' ও 'সুকু ও ভুকু' নিয়ে 'অ্যাকসিডেন্ট' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর দুমাস পরে 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' প্রকাশিত হয়। ১৩৭০ সালের ভাদ্র মাসে 'গল্প পঞ্চাশৎ' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় পঞ্চাশটি গল্প নিয়ে। একই বছরের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত 'আয়না' গল্পগন্থে ছিল চারটি গল্পÍ বাংলাদেশের হৃদয় হতে', 'গল্প নয়', 'বাদল আর বাতাস' ও 'মনের আয়নায় নিজের ছবি'। ১৩৭১ সালে 'কাকপণ্ডিত', 'চারহাটীর ষ্টেশন মাষ্টার', 'মতিলাল', 'মুখুজ্জে মহাশয়', 'মধু মাস্টার' ও 'হারানো সুর'

ছয়টি গল্প নিয়ে 'চিন্ময়ী' গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৩৭১ সালের মাঘ মাসে 'একটি প্রেমের গল্প' নামে আরেকটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় চারটি গল্প নিয়ে। গল্প চারটি হল 'একটি প্রেমের গল্প', 'অভিনয় ', 'জগন্নাথের রথ', 'চিনু মণ্ডলের কালাচাঁদ'। 'তপোভঙ্গ' নামে গল্প সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে 'তপোভঙ্গ', 'ফল্গু', 'সনাতন', 'প্রত্যাবর্তন' ও 'শ্রীনাথ ডাক্তার' এই চারটি গল্প এবং 'দীপার প্রেম' গল্পগ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'দীপার প্রেম', 'এ মেয়ে কেমন মেয়ে' এবং 'শঙ্করীতলার জঙ্গলে'Í এই তিনটি গল্প ।

১৯৬৮ সালে ভারত সরকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে সভাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। ১৯৭৪ সালের শ্রাবণ মাসে 'নারী রহস্যময়ী' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় পাঁচজন নারীর আলেখ্য নিয়ে। গল্পগুলো হল 'মলি', 'কৃষ্ণা', 'টুনুর কথা', 'বাত্যায়নী' ও 'কালো বৌ'। 'শিবানীর অদৃষ্ট' গল্প-সংকলনটি 'শিবানীর অদৃষ্ট' আর 'দেহের প্রদীপ রূপের শিখা' এই গল্পদুটি সহ পূর্বে প্রকাশিত পাঁচটি গল্পÍ 'ময়দানব', 'নারী', 'এ মেয়ে কেমন মেয়ে', 'মেলা' ও 'স্থলপদ্ম' নিয়ে প্রকাশিত হল। এই বছরেরই কার্তিক মাসে পুরানো গ্রন্থভুক্ত গল্প নিয়ে 'গবিন সিংয়ের ঘোড়া' ও 'জায়া' নামে দুটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় 'এক পশলা বৃষ্টি' ও 'ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প' এই দুইটি গল্পগ্রন্থ । ১৩৭৮ সালের ২৭ ভাদ্র, ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

১৩৭৮ সালেই 'সুতপার তপস্যা' ও 'একটি কালো মেয়ের কথা' নামক দুইটি বড় গল্পের সংকলন 'উনিশশ একাত্তর' প্রকাশিত হয়। মাঘ মাসে প্রকাশিত হয় 'ভবানন্দের কাশীযাত্রা', 'গবিন সিংয়ের ঘোড়া', 'উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড' ও 'ডগি-এ্যালশেসিয়ান নয়'Í এই চারটি গল্পের সংকলন 'উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড'। এই সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরের রচিত তারাশঙ্করের গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ভুবনে এক নতুন মাত্রা এনে দিল। প্রথমে তিনের দশকে গ্রাম নিয়ে লিখলেও আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা তাঁর প্রতিভাকে সীমিত করে দেয়নি বরং বাড়িয়ে দিয়েছে। কল্লোলের কালের লেখক হয়েও পুরোনোকে ভেঙে চুরে ছুঁড়ে ফেলার পক্ষে ছিলেন না তিনি বরং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এঁদের শিল্প-শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, অনুপ্রাণিত হয়েছেন। নিজের জীবন থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তাকে পূর্বসূরী, উত্তরসূরী এবং সমসাময়িক লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন:

> এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর গল্পের কাঠামোয় মেলে। তারাশঙ্করের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য, কিছুটা তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতাও বটে, কিছুটা পূর্বসূরী–নির্দিষ্ট প্রথার প্রতি আন্তরিক আনুগত্যও বলা যায়, লেখককে কিন্তু অন্য সতীর্থদের থেকে স্বতন্ত্র আসন দেয়। প্রথমত, একটি নিটোল কাহিনীবৃত্ত ও একাধিক ছোট বড় ঘটনার সমাবেশ তাঁর গল্পে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। দ্বিতীয়ত, ঘটনা থাকলেই যে নাটকীয়তা থাকবে তা নয়, ঘটনা গভীর ব্যঞ্জনার অনুবর্তী থেকে আত্মগোপন করে ব্যঞ্জনাকেই প্রতীকের প্রতিমা করতে পারে। কিন্তু তারাশঙ্করের গল্পে ঘটনার সঙ্গে আছে নাটকীয়তা, চমক, বিস্ময়কর আকর্ষণ। আবার কোথাও কোথাও মেলোড্রামার অংশায়ী হয়ে ওঠে কোন কোন ঘটনার সংযোজন। তৃতীয়ত, কাহিনী আছে, ঘটনা আছে, কিন্তু চরিত্রই লেখকের একমাত্র উদ্দিষ্ট। সে ক্ষেত্রে চরিত্র নিহিত জটিল মনস্তত্ত্বটি কাহিনী ও ঘটনার ওপরেই একান্ত নির্ভরশীল হয়। মনস্তত্ত্বের জটিল রহস্য বিশেষ চরিত্রের পক্ষে আত্ম-নির্ভরশীল না হয়ে বহিঃঅস্তিত্বের মুখাপেক্ষী হওয়ায় একটি আধুনিক চরিত্রের 'brooding' বৈশিষ্ট্য থেকে যে ব্যক্তিত্বের উন্মোচন, তা না হয়ে চরিত্র-মাত্রার স্বভাব অন্য মাত্রা আনে। চরিত্র মনের জটিল আলোয় আলোকিত হওয়ার থেকে ঘটনা তাড়িত হয়ে তার ভাগ্যচিত্রে সফল হয়। চতুর্থত, কাহিনী হয় বিবৃতিধর্মী। কাহিনীর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত টানা বিবরণ tale- এর পর্যায়ে চলে আসে। রীতি ও গদ্যের এই বিবৃতিধর্ম বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র- অনুমোদিত। [৯]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে একাল এবং সেকাল দুইকালের উপস্থিতি দেখা যায় কিন্তু এই দুই কালের দ্বন্দ্ব সেখানে ধরা দেয়নি, বরং এই দুই কালের প্রতিনিধিদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখিয়েছেন লেখক। জন্মস্থান লাভপুরের আঞ্চলিক জীবন থেকেও তিনি তাঁর অনেক গল্পের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছেন। রাঢ় বঙ্গের লোকায়ত জীবন, ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্র, উঠতি ধনতন্ত্র তারাশঙ্করের গল্পে প্রভাব ফেলেছে। চরিত্র চিত্রণেও তিনি ব্যতিক্রমী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এঁদের পরে তিনিই তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকাকে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো পরিস্থিতি-সচেতন, এই সচেতনতাই গল্পগুলোকে আরো সূক্ষ্ম, অর্থবহ এবং জীবন্ত করে তুলেছে। বিলীয়মান সামন্তযুগের ঐতিহ্যটুকুকে তিনি সম্মানের সঙ্গে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, পাশাপাশি রাঢ় বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজীবনকে তাঁর ছোটগল্পে শিল্পিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। কালসচেতন তারাশঙ্করের রাঢ় জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও অনুভূতি তাঁর ছোটগল্পকে করে তুলেছে আকর্ষণীয়, জীবননিষ্ঠ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ছোটগল্পগুলোর বিষয় নির্বাচনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কৌশলী হয়ে সমসাময়িক বিচ্ছিন্নতাকে ভিন্ন ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন। অলঙ্কারের বাহুল্য গ্রহণ না করে বিন্যাস রীতি, আঙ্গিকÍ এগুলোর ক্ষেত্রে নতুনত্ব নিয়ে এসেছিলেন তিনি। অবহেলিত, অস্পৃশ্য ব্রাত্যদের নিয়ে লেখক অতিমাত্রায় উৎসাহী ছিলেন এবং শিল্পিত ভাবে তাদের জীবনকে তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে। গোষ্ঠী-বৈচিত্র্য তারাশঙ্করের ছোটগল্প-ভাণ্ডারের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলা ছোটগল্পের বিস্তৃত অঙ্গনে তারাশঙ্করের গুরুত্ব স্বকীয়তায় প্রস্ফুটিত। সমকালে তারাশঙ্কর যত না পঠিত হয়েছেন, উত্তরোত্তর তাঁর মর্যাদা অধিক পরিমাণে বেড়েছে। বাঙালির সাহিত্য-রসিক মনকে এখনও তাঁর ছোটগল্প তৃপ্ত করে, বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসমূহের প্রকাশকাল অনুযায়ী একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল:

১৯২৬ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১. মুকুন্দের মজলিস
২. ভালচার ক্লাব
৩. উপন্যাসের উপদ্রব
৪. কলা কসরৎ

১৯২৭ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

৫. স্রোতের কুটো
৬. উল্কা

১৯২৮ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

৭. রসকলি
৮. হারানো সুর
৯. স্থলপদ্ম
১০. চোখের ভুল
১১. শ্মশানের পথে
১২. কুশ-পুত্তলী

১৯২৯ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৩. রাইকমল

১৯৩০ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৪. মরুর মায়া
১৫. প্রসাদমালা

১৯৩১ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৬. বড়-বৌ
১৭. মালাচন্দন

১৯৩২ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৮. আলো–আঁধারি
১৯. সর্বনাশী এলোকেশী

২০. সন্ধ্যামণি

১৯৩৩ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

২১. ডাইনীর বাঁশী
২২. মেলা
২৩. বাউল
২৪. রাজা, রাণী ও প্রজা
২৫. শ্মশান-বৈরাগ্য
২৬. খড়্গ
২৭. আখড়াইয়ের দীঘি
২৮. মধু মাস্টার
২৯. ব্যাধি
৩০. ট্যারা
৩১. ছলনাময়ী
৩২. পুরোহিত

১৯৩৪ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

৩৩. এ্যাও
৩৪. জলসাঘর
৩৫. নারী ও নাগিনী
৩৬. শ্রীনাথ ডাক্তার
৩৭. মুহূর্ত
৩৮. মুখুজ্জে মহাশয়
৩৯. ঘাসের ফুল
৪০. টহলদার
৪১. বিষধর
৪২. কুলীনের মেয়ে
৪৩. মহামারী

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

৪৪. পুত্রেষ্টি
৪৫. তারিণী মাঝি
৪৬. রাখাল বাঁড়ুজ্জে
৪৭. পদ্মবউ
৪৮. মতিলাল
৪৯. মন্থর বিষ
৫০. খাজাঞ্চি বাবু
৫১. রঙীন চশমা

১৯৩৬ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

৫২. আধলা ও পয়সা
৫৩. প্রতিধ্বনি
৫৪. সমুদ্র-মন্থন
৫৫. চণ্ডী রায়ের সন্ন্যাস
৫৬. প্রতীক্ষা
৫৭. ডাক-হরকরা
৫৮. রায়বাড়ি
৫৯. তাসের ঘর
৬০. মাছের কাটা
৬১. তপোভঙ্গ
৬২. ব্যাঘ্রচর্ম
৬৩. পণ্ডিতমশাই

৬৪. অগ্রদানী

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

৬৫. নুটু মোক্তারের সওয়াল
৬৬. ভ্রমণ কাহিনী
৬৭. প্রতিমা
৬৮. কাঁটা
৬৯. পঞ্চরুদ্র
৭০. বীণা মা
৭১. রাজপুত্র
৭২. তিন শূন্য
৭৩. সন্তান
৭৪. ইতিহাস
৭৫. হোলি

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

৭৬. কালাপাহাড়
৭৭. মুসাফিরখানা
৭৮. চৌকিদার
৭৯. রাজসাপ
৮০. রাঠোর ও চন্দাবত
৮১. সংসার
৮২. মা
৮৩. না
৮৪. রাধারাণী
৮৫. সাবিত্রী চুড়ি
৮৬. মালাকার
৮৭. শাপমোচন

১৯৩৯ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

৮৮. Í 'ট্রিটি'
৮৯. সুখনীড়
৯০. চোরের মা
৯১. শাপমোচন
৯২. বেদেনী

১৯৪০ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

৯৩. ডাইনী
৯৪. রাঙাদিদি
৯৫. বন্দিনী কমলা
৯৬. দিল্লীকা লাড্ডু
৯৭. চন্দ্রজামাইয়ের জীবন কথা
৯৮. পিঞ্জর
৯৯. চোর
১০০. কবি
১০১. এক রাত্রি

১৯৪১ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১০২. চারহাটির ষ্টেশনমাষ্টার
১০৩. হরি পণ্ডিতের কাহিনী

১০৪. যাদুকরী ১০৫. প্রত্যাবর্তন

১০৬. সনাতন

১৯৪২ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১০৭. রাণুর বিবাহ

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১০৮. ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহন বাগান ১০৯. শ্যামাদাসের মৃত্যু

১১০. জায়া ১১১. ময়দানব

১১২. মরা মাটি ১১৩. ইস্কাপন

১১৪. অহেতুক ১১৫. চব্বিশে ডিসেম্বর

১১৬. সুরতহাল রিপোর্ট

১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১১৭. শেষ কথা ১১৮. বোবা কান্না

১১৯. পৌষ-লক্ষ্মী ১২০. আখেরী

১৯৪৫ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১২১. দেবতার ব্যাধি ১২২. সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার

১২৩. জুয়াড়ী ১২৪. ইমারত

১২৫. তৃষ্ণা ১২৬. তমসা

১২৭. কান্না ১২৮. শবরী

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১২৯. নারী ১৩০. আরোগ্য

১৩১. কামধেনু ১৩২. কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি

১৩৩. যাদুকরের মৃত্যু

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৩৪. পাটনী ১৩৫. নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান

১৩৬. বিধাতা ও মানুষ ১৩৭. স্বাধীনতা

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৩৮. গবিন সিংয়ের ঘোড়া

১৯৪৯ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৩৯. মাটি

১৪০. বেদের মেয়ে

১৯৫০ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৪১. বাঞ্ছাপূরণ

১৪২. ময়দান

১৪৩. গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী

১৯৫১ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৪৪. ডাইনী

১৪৫. বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

১৪৬. শিলাসন

১৪৭. প্রহ্লাদের কালী

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৪৮. বরমলাগের মাঠ

১৪৯. বিষ্টু চক্রবর্তীর কাহিনী

১৫০. জটায়ু

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৫১. হেডমাস্টার

১৯৫৫ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৫২. জন্মান্তর

১৫৩. কালো মেয়ে

১৫৪. বিস্ফোরণ

১৫৫. একটি মুহূর্ত

১৫৬. আফজল খেলোয়াড়ী ও রজমান শের আলি

১৫৭. আলোকাভিসার

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৫৮. কমল মাঝির গল্প

১৯৫৭ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৫৯. বিষপাথর

১৬০. বাবুরামের বাবুয়া

১৬১. রবিবারের আসর

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৬২. মানুষের মন

১৬৩. সাপুড়ের গল্প

১৯৬১ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৬৪. সুকু ও ভুকু

১৯৬২ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৬৫. অ্যাক্সিডেন্ট

১৬৬. কয়েক ফোটা রক্ত

১৬৭. শেষ অভিনয়

১৯৬৩ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৬৮. অভিনয়

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৬৯. চিনু মণ্ডলের কালাচাঁদ

১৭০. জগন্নাথের রথ

১৭১. একটি প্রেমের গল্প

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৭২. ভুলোর ছলনা

১৭৩. এ মেয়ে কেমন মেয়ে

১৯৬৬ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৭৪. শঙ্করীতলার জঙ্গলে

১৭৫. দীপার প্রেম

১৭৬. রূপসী বিহঙ্গিনী

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৭৭. দিগ্বিজয়ী ও নগ্ন-সন্ন্যাসী

১৭৮. দেহের প্রদীপে রূপের শিখা

১৭৯. ডগিÍ এ্যালশেসিয়ান নয়

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৮০. শিবানীর অদৃষ্ট

১৮১. ভূত-পুরাণ

১৮২. এক পশলা বৃষ্টি

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৮৩. অক্ষয়বটোপাখ্যানম্

১৯৭০ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প :

১৮৪. ভবানন্দের কাশীযাত্রা

১৮৫. প্রত্যাখান

১৮৬. স্বর্গলোকে ভূমিকম্প

১৮৭. গোপালবাঁধের ইতিকথা

১৮৮. উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

১৮৯. সখী ঠাকরুন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ ছোটগল্প গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কখনও কখনও একই গল্প একাধিক গ্রন্থ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. ছলনাময়ী (১৯৬৩)
২. জলসাঘর (১৯৩৭)
৩. রসকলি (১৯৩৮)
৪. তিন শূন্য (১৯৪১)
৫. প্রতিধ্বনি (১৯৪৩)
৬. বেদেনী (১৯৪৩)
৭. দিল্লীকা লাড্ডু (১৯৪৩)
৮. যাদুকরী (১৯৪৪)
৯. ১৩৫০ (১৯৪৪)
১০. ইমারত (১৯৪৭)
১১. রামধনু (১৯৪৭)
১২. শ্রীপঞ্চমী (১৯৪৭)
১৩. মাটি (১৯৫০)
১৪. কামধেনু (১৯৫১)
১৫. শিলাসন (১৯৫২)
১৬. বিস্ফোরণ (১৯৫৫)
১৭. বিষপাথর (১৯৫৭)
১৮. মানুষের মন (১৯৫৯)
১৯. রবিবারের আসর (১৯৫৯)
২০. পৌষ-লক্ষ্মী (১৯৬০)
২১. আলোকাভিসার (১৯৬০)
২২. চিরন্তনী (১৯৬১)
২৩. অ্যাক্সিডেন্ট (১৯৬২)
২৪. তমসা (১৯৬৩)
২৫. আয়না (১৯৬৩)
২৬. চিন্ময়ী (১৯৬৪)
২৭. কিশোর সঞ্চায়ন (১৯৬৬)
২৮. তপোভঙ্গ (১৯৬৬)
২৯. দীপার প্রেম (১৯৬৬)
৩০. জায়া (১৯৬৭)
৩১. শিবানীর অদৃষ্ট (১৯৬৭)
৩২. গবিন সিংয়ের ঘোড়া (১৯৬৮)
৩৩. এক পশলা বৃষ্টি (১৯৬৮)
৩৪. মিছিল (১৯৬৯)
৩৫. রূপসী বিহঙ্গিনী (১৯৭০)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্প বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমায়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই সাময়িক পত্রগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. পূর্ণিমা
২. কল্লোল
৩. উপাসনা
৪. কালি-কলম
৫. উত্তরা
৬. নবশক্তি
৭. ভারতবর্ষ
৮. বঙ্গশ্রী
৯. অভ্যুদয়
১০. প্রবাসী
১১. শনিবারের চিঠি
১২. দেশ
১৩. নাগরিক
১৪. আনন্দ বাজার
১৫. নতুন পত্রিকা
১৬. কেশরী
১৭. সচিত্র ভারত
১৮. পরিচয়
১৯. অলকা
২০. বৈজয়ন্তী চতুরঙ্গ
২১. যুগান্তর
২২. দিগন্ত
২৩. সোনার বাংলা
২৪. দৈনিক বসুমতী
২৫. কথাশিল্প
২৬. গল্পভারতী
২৭. রংমশাল
২৮. ছায়াপথ
২৯. মৌচাক
৩০. তরুণের স্বপ্ন
৩১. জয়যাত্রা
৩২. শিশুসাথী
৩৩. শারদীয়া
৩৪. উল্টোরথ
৩৫. বিংশ শতাব্দী
৩৬. অমৃত
৩৭. উত্তরায়ণ
৩৮. নীহারিকা
৩৯. জলসা
৪০. ইন্দ্রনীল
৪১. সন্দেশ
৪২. ঝিলিমিলি
৪৩. মণিহার

তথ্যপঞ্জি ঃ

১. বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, মে ২০০০) পৃ ১৫

২. সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্কর: জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯) পৃ ১৭

৩. শান্তনু পাল, *তারাশঙ্করের ছোটগল্প: বিষয় ও আঙ্গিকরীতি* (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ২০১১) পৃ ১৬-১৭

৪. উদ্ধৃত: নিতাই বসু, *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস* (কলকাতা: প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮৮) পৃ ৩৫-৩৬

৫. উদ্ধৃত: নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮

৬. উদ্ধৃত: নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯

৭. উদ্ধৃত: নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১

৮. উদ্ধৃত: নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১

৯. বীরেন্দ্র দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৮-১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাঢ় বাংলার সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পৃক্ততা

বীরভূমের লাভপুর গ্রামে ছোটখাটো এক জমিদার পরিবারে ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। তবে তারাশঙ্করের অঞ্চলে শাস্ত্রমতে ৭ই শ্রাবণ ধরা হয়। "..... ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসেÍ বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বলগ্নে আমার জীবনযাত্রা শুরু। আমাদের অঞ্চলে বলে, ব্রাহ্মমুহূর্তে, সূর্য উদিত হন নি, তাঁর লাল আভা ফুটেছে পূর্বদিগন্তে, এমনি সময় আমার জন্ম বলে শাস্ত্রমতে আমার জন্মদিন ৭ই শ্রাবণ। অল্পকয়েক মুহূর্তের জন্য একদিন আয়ু আমার হয় বেড়ে গেছে বা ক'মে গেছে।" [১] জমিদারতন্ত্র তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে আর ধনতন্ত্র সেই জায়গাটা দখল করে নিচ্ছেÍ সমাজের এরকম একটা সময়ে তারাশঙ্করের জন্ম। ক্রমবিলীয়মান জমিদার শ্রেণীর বংশধর হিসেবে তাঁর মনে সেই পড়ন্ত সামন্তবাদের আভিজাত্যের প্রতি একধরনের সম্ভ্রম ছিল। বংশগত সূত্রে সামন্তবাদের আভিজাত্য তাঁর মধ্যে থাকলেও সময়ের প্রবহমানতায় অর্থনৈতিক সংকটের ভিতর দিয়ে তাঁকে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হয়। পরবর্তী সময়ে সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, সাহিত্যের মাধ্যমে দেশসেবায় নিযুক্ত হতে চেয়েছিলেন। এছাড়া জন্মস্থান লাভপুর গ্রামের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে।

তারাশঙ্করের পিতামহ দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় উকিল ছিলেন, তিনি তিনটি বিয়ে করেছিলেন। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর একমাত্র এবং শেষ বয়সের সন্তান। পিতার স্নেহ পেয়ে হরিদাস খেয়ালী হয়ে উঠেছিলেন। হরিদাস তাঁর পুত্র তারাশঙ্করকে বিদ্যার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আট বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে তারাশঙ্কর দিশেহারা হয়ে পড়েন। পিতার মৃত্যুর পর মা প্রভাবতীর স্নেহছায়ায় তিনি তাঁর জীবনের ভিত্তি গড়েছেন। তাঁর মা তাঁকে ছোটবেলা থেকে দেশসেবার প্রতি মনোযোগী করে তুলেছিলেন, প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলেছিলেন। বাবা ও মা ছাড়া পিসিমা শৈলজা তারাশঙ্করের ব্যক্তিজীবনে প্রভাব ফেলেছেন। তারাশঙ্করের পিতা মারা যাবার পর এই পিসিমাই তাঁদের জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। তারাশঙ্করের মানসসত্তা এই তিন ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় পরিশীলিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পিতা হরিদাস সেকালের মানুষ হয়েও আধুনিক চিন্তা-

চেতনার অধিকারী ছিলেন, বিলেতি ঘরানার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ডায়রিও লিখতেন। সেখানে পিতা হরিদাস পুত্র তারাশঙ্কর সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক মন্তব্য করেছেন:

> অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছি। পৈত্রিক সম্পত্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা সম্মান দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈত্রিক সম্মান বংশ প্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে। এবং সরস্বতী মায়ের কাছে যে সংকল্প করিলে তাহা বজায় রাখিতে হইবে। তুমি উকিল হইবে। আমার বাবা শেষ জীবনে শখ করিয়া শালের শামলা কিনিয়াছিলেন। ঐ শামলা আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি। ঐ শামলা তোমাকে পরিতে হইবে। এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে। [২]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালে উকিল না হয়েও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে।

রাঢ় বাংলার লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম, জন্মস্থান বলেই হয়ত লাভপুর রুক্ষ হয়েও তারাশঙ্করের এত প্রিয়, এত কাছের। লাভপুরের সমাজ-জীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানবগোষ্ঠী এসবই তারাশঙ্করের ছোটগল্পে সমান মর্যাদা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণীর মানুষ হয়েও এই গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষকে তিনি অবহেলা করেননি। 'আমার কালের কথা'য় তারাশঙ্কর তার জন্মের সময়ের লাভপুরের চিত্র তুলে ধরেছেন:

> প্রাচীন রাঢ় বরেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগের নাম মানুষ ভুলে গিয়েছে। বিস্মৃতনামা প্রাচীন রাঢ়ের এক প্রান্তে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম। আমার সূতিকাগৃহ আজও আছে।
> .....
> ..... আমাদের গ্রামের জমিদারের আয় পাঁচ থেকে সাত-আট হাজার। কিন্তু তাতেই তাঁদের প্রবল পরাক্রম। ..... তাঁরা বলতেন — 'মাটি বাপের নয়, দাপের ; দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে। [৩]

এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হল উঠতি পুঁজিপতি ভাগ্যবান ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিরোধ। লাভপুর–সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজজীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলেছে মহাসমারোহ প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলেছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর বিচিত্র বিরোধ।

রাঢ় বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব রুক্ষ; এখানকার নদী, মাটি, গাছপালা কোন কিছুতেই স্নিগ্ধতার ছোঁয়া নেই। রূঢ় প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এখানকার মানুষও যেন রুক্ষতায় মোড়া। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা এই রাঢ় বাংলা। রাঢ় বাংলাকে প্রাচীনকাল থেকেই কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নবম দশম শতক থেকে স্পষ্টত দুটি ভাগে রাঢ় বাংলাকে ভাগ করা হয়েছিল। তা হচ্ছে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। "একাদশ শতকের প্রথম পাদে এই বিভাগ দুটি উত্তীর লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কন লাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়) নামেও পরিচিত হয়েছিল। আনুমানিক নবম শতকে গঙ্গারাজ দেবেন্দ্র বর্মনের এক লিপিতিই এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর একাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতেও এর উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হতে হতে উত্তীর লাঢ়ম ও তক্কন লাঢ়ম যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ে পরিণত হয়েছে।" [৪]

বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে বীরভূমের অর্থ করেছেন জঙ্গলাকীর্ণ দেশ হিসেবে। কারণ মুণ্ডারী অভিধানে 'বীর' শব্দের অর্থ জঙ্গল। বীরভূমের ভৌগোলিক পরিচয় বিনয় ঘোষ তুলে ধরেছেন :

> ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর বীরভূম ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। তখন বীরভূম জমিদারীর সীমানা ছিল বর্ধমান বীরভূম (সদর), সাঁওতাল পরগণা (দেওঘড়, জামতাড়া ও সদরের দক্ষিণ-পূর্বাংশ)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে, ১৭৮৭ সালে যুক্ত বিষ্ণুপুর, বর্ধমানে স্থানান্তরিত হয়। তখন বীরভূমের এলাকা ছিল বর্তমান সদর মহকুমা এবং সাঁওতাল পরগণা (সদরের উত্তরভাগ ছাড়া)। পরবর্তী পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :
>
> ১৭৯৩ সালে মুর্শিদাবাদের ২৫০ গ্রাম বীরভূমে যুক্ত হয় (+৪ আংশিক)। ১৭৯৯ সালে পঞ্চকোট ও ঝালদা (রামগড় জেলা) যুক্ত হয় বীরভূমে (+৫ আংশিক)। ১৮০৫ সালে ষোলটি জঙ্গলমহল (পঞ্চকোট বাঘমুণ্ডি ঝালদা ঝরিয়া জয়পুর পাতকুম প্রভৃতি) নতুন জঙ্গলমহল জেলায় যুক্ত হয় (– ৫ আংশিক)। ১৮০৬ সালে দক্ষিণের সীমানা হয় অজয় নদ, এবং ভাগীরথীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ বীরভূমে যুক্ত হয়। (+৮ আংশিক) ১৮৫৪ সালে ভরতপুর থানা মুর্শিদাবাদে যুক্ত হয় (– ৮ আংশিক)। ১৮৫৫ সালে নতুন সাঁওতাল পরগণা জেলা গঠিত হলে বীরভূমের আগেকার অনেকাংশ তার সঙ্গে যুক্ত হয় (–১)। ১৮৭২ সালে রামপুরহাট নলহাটি ও পলমা থানা মুর্শিদাবাদে যুক্ত হয় (–২), তারপর ১৮৭৯ সালে পুনরায় এই অংশ বীরভূমে যুক্ত হয় (–২)। [৫]

অজয় নদ, দামোদর নদ, ময়ূরাক্ষী নদী এগুলো রাঢ় বাংলার খরস্রোতা নদী। অজয় নদী উত্তর রাঢ় আর দক্ষিণ রাঢ় বিভক্ত করে রেখেছে। দামোদর নদ আদিবাসীদের খুব প্রিয় নদ। বহুকাল ধরে অনার্য উপজাতি, যেমন অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীজাত উপজাতিরা রাঢ় এলাকায় বসবাস করত। সমাজবিদদের ধারণা অনুযায়ী পশ্চিম সীমান্তের রাজমহল ও দক্ষিণ-পশ্চিমের ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা পূর্বে রাঢ়ের সমতলস্থানের বাসিন্দা ছিল। ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটলেও রাঢ় জনপদ অনেকদিন পর্যন্ত আর্যপ্রভাবমুক্ত ছিল। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা জঙ্গলাকীর্ণ ও দুর্গম হওয়ার কারণে সম্ভবত আর্যদের প্রবেশ সহজ হয়নি। পলিমাটিবাহিত উর্বর পূর্ববঙ্গের তুলনায় রাঢ়বাংলার পাথর মিশ্রিত রাঙা মাটির বৈশিষ্ট্য একেবারেই ভিন্ন। এখানকার মাটি রুক্ষ, প্রকৃতি রুক্ষ, এখানকার মানুষগুলোর আচার-আচরণও রুক্ষ। রাঢ়ের দুটি অংশের মতো এখানকার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও দু'রকম। এই দ্বৈত রূপ সমাজবৈজ্ঞানিক বিনয় ঘোষ বিশ্লেষণ করেছেন:

> ..... রাঢ়ের নিসর্গ রূঢ়। রূঢ়তার কন্দরে অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহের নির্ঝর, উদ্দাম ও গতিশীল। রূঢ়তার বহিরাবরণ ভেদ করে তবে এই নির্ঝরের উচ্ছ্বাসকেন্দ্রে পৌঁছতে হয়। রাঙামাটি কাঁকরবালি আর ঝামা পাথরের মধ্যে মধ্যে সবুজের স্নিগ্ধতা বিকীর্ণ। এই নিসর্গই জয়দেব–চণ্ডীদাসের মধুনিস্যন্দী কাব্যনির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ করেছে, তান্ত্রিক পীঠস্থানে বহু শাক্ত উপাসকের কঠোর শক্তিসাধনার মদিরা যুগিয়েছে এবং লোকায়ত সংস্কৃতির উষ্ণ প্রস্রবণটিকে যুগ যুগ ধরে সজীব করে রেখেছে। [৬]

জন্মস্থান লাভপুরের মৃত্তিকা-উৎসারিত জীবনবোধ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিমানসে ক্রিয়াশীল ছিল সবসময়। আধুনিক কালের লেখক হয়েও উনিশ শতকের জীবনবোধ থেকে আদিবাসীদের জীবন নিয়ে চর্চা করেছেন। শাক্তের কাঠিন্য আর বৈষ্ণবের ঔদার্যÍ রাঢ় বাংলার এই দুটি রূপ তারাশঙ্করের ছোটগল্পেও দুটি ধারা সৃষ্টি করেছে। দ্বন্দ্বময় প্রকৃতি অদৃশ্যভাবে তাঁর সাহিত্যের পরিচর্যায় সহায়তা করেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃজনভূমিতে রাঢ় বাংলার প্রকৃতির প্রভাব তাই চিরস্মরণীয়। শুষ্ক মাটি, সবুজের স্বল্পতা, পাথুরে মাটি আর নদীগুলোর ভয়ংকর খরস্রোতা রূপ রাঢ় বঙ্গের নিজস্ব রূপ। ছোটবেলা থেকে তারাশঙ্কর এই রুক্ষ, শুষ্ক রূপের সঙ্গে পরিচিত। শুকনো মৌসুমে রৌদ্রের প্রখরতায় মাটি ফেটে যাওয়া, নদীগুলোতে পানি কমে যাওয়াÍ এসবই এই এলাকার মানুষগুলোর অজ্ঞাত নয় এবং তারা এই প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই জীবিকা-নির্বাহ করে। এই প্রকৃতি এখানকার আদিবাসী মানুষগুলোকে করে তুলেছে উগ্র, স্বাধীনচেতা। প্রকৃতির বিরূপতার সঙ্গে তাদের প্রতিনিয়ত লড়তে হয়। নদীবাহিত পলিমাটির পাড়ের মানুষদের তুলনায় রাঢ়ের

অধিবাসীরা তাই অনেক বেশি পরিশ্রমী, সংগ্রামী; অনেকটা হিংস্রও বটে। নিজের জন্মস্থানের প্রকৃতিকে, মানুষকে তারাশঙ্কর কখনও হেয় করেননি বরং তাদের থেকে জীবনরস আহরণ করে তাঁর সাহিত্যকে রসময় করে গড়ে তুলেছেন :

> বীরভূমকে কেন্দ্র করে রাঢ় জনপদ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের নিজস্ব 'জগৎ'। এখানকার প্রকৃতি পরিবেশ, সমাজ ও জনজীবনের সান্নিধ্যে আহরিত উপলব্ধিই তাঁর রাঢ়ভিত্তিক সাহিত্যের মাধ্যমে বিম্বিত হওয়া স্বাভাবিক।
>
> জীবনবোধের উৎসরূপে অঞ্চল ও তার আমূর্তি বৈশিষ্ট্য তাঁর সাহিত্যের ঐশ্বর্য। অভিজ্ঞতালব্ধ প্রকাশে রাঢ়ের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যময় জনজীবন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অপরিহার্য উপকরণ। [৭]

রাঢ় বাংলার সামাজিক, প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও অথনৈতিক রূপের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাল্যপরিচয়। তাঁর রচিত ছোটগল্পের সবগুলোতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা না থাকলেও যে গল্পগুলোতে রাঢ় বাংলার পটভূমি রয়েছে বা রাঢ় বাংলার গোষ্ঠীগত জীবন উঠে এসেছে সেসব রচনায় যুক্ত হয়েছে আলাদা মাত্রা। একবার কথাপ্রসঙ্গে একজন সাহিত্যিককে তিনি বলেছিলেন: "আমার বই বলুন আর যাই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই রাঢ় দেশ। এর ভেতর থেকেই আমার যা কিছু সঞ্চয়। এখানকার মানুষ, এখানকার জীবন নিয়ে লিখেছি।" [৮] 'আমার সাহিত্য জীবন'–এ তিনি লিখেছেনÍ "এদেশের মানুষকে জানার একটা অহংকার ছিল। ..... এদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে পরিচয়ের একটা বড় সুযোগ আমার হয়েছিল। ..... তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে।" [৯]

লাভপুরকে তারাশঙ্কর অদ্ভুত গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বীরভূম জেলায় উনিশ শতকে আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর অবস্থান এবং প্রভাব ছিল। পরবর্তীতে হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছে। ধর্মীয় জীবনে ও সামাজিক জীবনে উত্তর ভারতের কেন্দ্রীয় সভ্যতার প্রভাব পড়েনি অনেকদিন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে শহর সভ্যতার সঙ্গে এদের সংযোগ ঘটেছে। এখানকার পুরানো মন্দিরগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতির পরিচায়ক। অজয়নদের তীরে কেন্দুলী থেকে তারাপীঠ পর্যন্ত বহু সাধকের বেদপীঠ রয়েছে। সামাজিকভাবে ব্রাত্য বা পতিত শ্রেণীর পদ চিহ্নস্পৃষ্ট রাঢ়ের মাটি, বৈষ্ণব-বাউলও রাঢ় মৃত্তিকার সঙ্গে একীভূত হয়ে লোকায়ত জীবনকে মহিমান্বিত করেছে।

লাভপুর গ্রামে পড়ন্ত জমিদার সম্প্রদায়ের সঙ্গে উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের সমকালে বিদ্যমান ছিল। একাল সেকালের দ্বন্দ্বে কালিমালিপ্ত হয়ে উঠেছিল এই বিরোধ। ভালো কোনো কিছু নিয়ে সেই বিরোধ ছিল না, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে সেই বিরোধ ধীরে ধীরে বাড়ছিল। কেউ কাউকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিল না। এই সমস্ত বিরোধ, দ্বন্দ্বÍ এগুলোর মধ্যে দিয়েই লাভপুর গ্রামে শিক্ষা সাহিত্যের প্রসার ঘটেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্কুল, লাইব্রেরি, খেলার মাঠ, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মন্দির ইত্যাদি। তারাশঙ্কর দেখলেন সমাজের পরিবর্তনে স্বল্প আয়ের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। যারা অবস্থাসম্পন্ন তারা প্রতিষ্ঠা নিয়ে দ্বন্দ্বে মেতে ছিল, অন্যদের কথা তারা চিন্তা করেনি। অসহায় ভেঙে পড়া মানুষকে উনিশ শতকের জীর্ণ সমাজ অকৃপণভাবে আশ্রয় দিয়েছে। নতুন কালের শুরুতেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং তা রদ-করণ সংঘটিত হল। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আইন অমান্য আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাতীয় জীবনের এইসব স্মরণীয় ঘটনার ধারা বেয়ে লাভপুর গ্রামের সামনেও এই নতুনকালের নতুনরূপ হাজির হয়েছিল। মহানগর কেন্দ্রিক বিশেষ ঘটনা যেমন হরতাল, বিলেতি বস্ত্রে আগুন, মানিকতলায় বোমা হামলা, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনায় লাভপুর গ্রামেও এসেছিল নতুন শতকের ছোঁয়া। 'বন্দেমাতরম' থিয়েটার, 'দরিদ্র সেবা ভাণ্ডার'–এগুলো তৎকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠিত এবং এ দুটোকে কেন্দ্র করে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল। তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তা এই ভিত্তিভূমিতেই তাঁর কৈশোর অতিক্রম করছিল। তিনি এই লাভপুর গ্রামে থেকেই দেখেছেন অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হচ্ছে, কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সরিয়ে শিল্পকেন্দ্রিক জীবন জায়গা করে নিচ্ছে। দারিদ্র্যের ভয়াল রূপের পাশাপাশি বিত্তবানদের বিত্তের অহংকারও দেখেছেন এবং নিজের লেখক সত্তাকে শানিত করে নিয়েছেন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক বলেছেন:

> ঊনবিংশ শতাব্দীতে বীরভূমের সামাজিক পরিবেশের জীবন যাত্রায় ছিল রক্ষণশীল ধারা। বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আলোড়ন অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবনে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে সমাজ জীবনে যে পরিবর্তনের ধারা এসেছিল, এই শতকের সেই পরিবর্তনের ঢেউ বীরভূমের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ..... সুতরাং বিশ শতকের যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে বাংলা কথাসাহিত্যের নববিকশিত রূপ, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর সেই পটভূমি-রসপুষ্ট। তবে বৃহত্তর এই জীবন পরিবেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কূলে কূলে উনিশ শতকের রাঢ়ের কৌম সংস্কৃতির প্রভাব তাঁর জীবনের এক বড় অংশ অধিকার করেছিল। [১০]

রাঢ়ের নদনদী, পরিবেশ পরিজন, রাঢ়ের মাটি, আদিবাসী, ধূধূ করা মাঠ, কণ্টকাবৃত জঙ্গল, কাঁকর মিশ্রিত পথঘাটÍ রাঢ় বাংলার প্রকৃতিপ্রদত্ত এই বৈশিষ্ট্যগুলো তারাশঙ্করের মানসজগতে এমনভাবে সক্রিয় ছিল যে তাঁর ছোটগল্পের চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনীর বিষয়-নির্বাচন, পরিচর্যারীতিÍ সর্বক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাঢ় বাংলার প্রভাব চলে এসেছে। লেখক নিজেই তা বহুবার স্বীকার করেছেন। তারাশঙ্করের সাহিত্য থেকে রাঢ় বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা, রাঢ়ের জনজীবন, রাঢ়ের আঞ্চলিকতা, রাঢ়ের লোকায়ত জীবনের স্বাতন্ত্র্য বাস্তবতাসহকারে পাঠকের মনে ভেসে ওঠে। করুণাসিন্ধু দাসের ভাষায়:

> তারাশঙ্কর-সাহিত্যের চরিত্রলিপি বিচিত্র ও বহুতালিক এবং তাদের চলাফেরা জীবনযাপনের ইতিহাস ভূগোল স্বদেশখণ্ডের স্থাবর-জঙ্গম জটিল চলন-প্রক্রিয়ার মুকুরে নিহিত থাকার সুবাদে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষকও বটে। রাঢ়ের অনাবৃত উন্মুক্ত ডাঙা-ডহর, নদী, মাঠ-ঘাট, লোকালয় সেখানে আপন মহিমায় আকাশের সাতরঙা রামধনুর চালচিত্র হয়ে মানুষের ছবি সাজিয়ে তোলে। সাক্ষাৎ দ্রষ্টা লেখক কোথাও তার রসিক ভাষ্যকার– বর্ণনায়, ব্যাখ্যানে, উপমা–রূপকে তার রূপকল্প নির্মাণে তিনি মশগুল। [১১]

প্রতিটি সাহিত্যিকের তাঁর নিজের জন্মস্থানের প্রতি আলাদা একটি টান থাকে। তারাশঙ্করও তাঁর ব্যতিক্রম নন; নিজের পরিচিত অঞ্চল, পরিচিত পরিবেশ, পরিবেশের ভূপ্রকৃতি, সেই পরিচিত এলাকার মানুষ তাঁর রচনার মূল সম্পদ। অনুভূতি, আবেগ স্থান-কালের মধ্যে আবদ্ধ বলেই কোন কোনো শিল্পী কোনো না কোনো অঞ্চল দ্বারা প্রভাবিত হন, আবার অনেকে নাও হতে পারেন। সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক উদ্ধৃত করেছেন :

> The Novelist generally wants to write about his own country, mental, social or geographycal and no other is equally interesting to him. [১২]

তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্পের পটভূমিতে রাঢ় জনপদের লোকজীবন রয়েছে। এদের আচার আচরণ সংস্কৃতি নিয়েই সেইসব গল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যক্তিগত পরিবেশ, বীরভূমের লাভপুর গ্রাম, এই সূত্রে তারাশঙ্কর রাঢ় ভূখণ্ডকে আপন সত্তা দিয়ে জেনেছিলেন, অন্তরের গভীর আবেগ দিয়ে এখানকার লোকজীবনের ছবি এঁকেছেন। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বার বার তিনি তাঁর এই জন্মস্থানের পরিবেশ-প্রকৃতি-মানুষের কথা বলেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে। তাঁর বীরভূমের ভূবৈচিত্র্যের প্রতি কৌতূহল, আকর্ষণ ও

মমতা ছিল গভীর। "এক প্রান্তে শাল পলাশের বন, আর এক প্রান্ত গিয়ে সীমা টেনেছে উদ্ধারণপুরের শ্মশান ঘাটে। মাঝখানে কোথায়ও কোথায়ও ফসলের ভরাক্ষেত কোথায়ও বা মহানাগের বিষ নিঃশ্বাসে জর্জরিত কাঁকর বিকীর্ণ বিশাল ব্রক্ষডাঙ্গা যার নাম হয়তো ছাতিফাটার মাঠ।" [১৩] এই প্রত্যন্ত ভূখণ্ডকে তারাশঙ্কর আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন।

বৈচিত্র্যময় রাঢ় ভূখণ্ডের মতো এখানকার অধিবাসীদের পেশা ও জীবন বৈচিত্র্যময়। এই রাঢ় ভূখণ্ডকে জঙ্গলাকীর্ণ বলে প্রাচীন জৈন সূত্রগ্রন্থে এই ভূখণ্ডকে (লাড় হিসেবে পরিচিত তৎকালীন সময়ে) জনমানবহীন বনভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লালমাটি, পাথর, কাঁকর দিয়ে এই অঞ্চলের ভূমি গঠিত, বনও রয়েছে, শালবনের ভিতরে দিয়ে গ্রামান্তরে যেতে হয়। কোথাও কোথাও বিস্তীর্ণ প্রান্তর-তাও ধূলো ভরাÍ রুক্ষ লাল ধূলো। এই অঞ্চলকে তারাশঙ্কর ভালোবেসে তাঁর সাহিত্যের, ছোটগল্পের উপাদান করেছেন। এই কারণে কখনও কখনও তারাশঙ্করকে আঞ্চলিক সাহিত্যিক হিসেবে কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন:

> সাহিত্যে 'আঞ্চলিকতার' একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবেশ মাত্র ফ্রেমের কাজ করেÍ তাকে অলংকরণের অতিরিক্ত কিছু বলা যায় না, কখনো কোন বিশিষ্ট পটভূমি রচনায় বিশেষ ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে খানিকটা সাহায্য করে থাকে। এগুলির ভিত্তিতেও কোন লেখককে আঞ্চলিক বলা যায় না। ওই নির্দিষ্ট বিশেষণটি তখনই কোনো শিল্পীর ওপরে আরোপ করা সম্ভবÍ যখন বিশেষভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠেÍ তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সেই বিশিষ্ট ভিত্তি ক্ষেত্রের স্বাভাবিক শষ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর স্থানিক সাহিত্য হয়েও রসাবেদনে তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়। [১৪]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক সাহিত্যিক নন, যদিও একটি বিশেষ অঞ্চল থেকে তিনি তাঁর সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনকে কোথাও কোথাও পটভূমি করে তাদের বিচিত্র জীবনকে চিত্রিত করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাঢ়ের বিচিত্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 'যাদুকরী' গল্পের যাদুকর বাজিকর শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর চলাফেরা ছিল। 'যাদুকরী' গল্পে যে সিদ্ধলরাজ ভবদের ভট্টের কথা বলা হয়েছে সেই সিদ্ধল বা সীথল গ্রামের অস্তিত্ব লাভপুর গ্রামে রয়েছে:

> যাদুকরী যাদের নিয়ে লেখা তারা আমাদের ও অঞ্চলের একটি সম্প্রদায়। এদের সঙ্গে ঘুরেছি, এদের গ্রাম আমাদের গ্রামের খুব কাছে– সে গ্রামের কিছু জমিদারী অংশ আমাদের ছিল। সে গ্রামে গিয়েছি, তাদের বাড়ির দাওয়ায়, উঠানে বসেছি, ওদের সম্পর্কে প্রবাদ কাহিনী, ইতিহাস সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছি। জেনেছি। [১৫]

তাঁর সঙ্গে রাঢ় বাংলার এইসব অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আত্মিক সংযোগও ছিল। এসব গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয়-সূত্রে সমৃদ্ধ ছিল তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখকের বিশেষ সম্পদ। শিল্পীর সার্থকতা অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক রচনাতেই ঘটে থাকে। সাহিত্যস্রষ্টা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র, পটভূমি ও পরিবেশকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করতে পারেন। রবার্ট লেডেল এই অভিজ্ঞতার গুরুত্ব সমর্থন করেছেন– "The range of the novelist, that is, those parts of his experience which he is able to use creatively, is probably a matter over which he is possesses little control. It has generally been dictated to him by his nature or his early environment. The importance of early environment in determining a writer's range could be provided over and over again." [১৬]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'ডাইনী'র যে ধারণা 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, সেই ডাইনীও তাঁর চেনা। নিজের বাড়ির পাশের মানুষজন থেকেও তিনি গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পের ডাইনী স্বর্ণ লেখকের পরিচিত। লাভপুরের একজন গন্ধবণিকের সন্তানহীনা বিধবা মেয়ে স্বর্ণকে নিয়ে এই আশ্চর্য গল্পটি তারাশঙ্কর লিখেছেন। তাঁর বাইরের বাড়ির পুকুরের ওপারে স্বর্ণ-ডাইনী থাকত, সেই দেখা থেকেই এই গল্পের জন্ম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। কোনো সাহিত্য-সমালোচক তারাশঙ্করের ডাইনীকে ইউরোপীয় সাহিত্যের উইচক্র্যাফট থেকে ধার করা চরিত্র বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ শিল্পিসত্তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি বলেছেন:

> ..... আমিও তাঁদের তাই বলেছি। এ তারাশঙ্করের দেখা ডাইনী, সে তাকে দেখেছে। পড়তে পড়তে আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণ দুপুর বেলা বসে আছে আর সামনে তালগাছটার মাথায় চিল ডাকছে। আমাদের দেশের এঁরা

> ইউরোপের উইচক্র্যাফটের কথা অনেক পড়েছেন। শহরে থাকেন, গ্রামের ডাইন দেখেন নি। তাই উইচ নিয়ে গল্প হলেই মনে করেন, বিদেশ থেকে না বলে ধার করেছে। [১৭]

যাদুকরদের পাশাপাশি পটুয়া, বৈষ্ণব, শাক্ত-উপাসক, বেদে, সাপুড়ে প্রভৃতি বিচিত্র পেশাজীবী মানুষদের তারাশঙ্কর দেখেছেন চলতে-ফিরতে, হাটে-মাঠে-ঘাটে, বাড়ির সামনে-পিছনে। কখনও কখনও অন্তরঙ্গতাও ছিল, জমিদার বংশের সন্তান হয়েও সমাজের নিচুতলার এই অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষগুলোকে তিনি অনুভব করেছেন। অস্পৃশ্য ভেবে দূরে সরিয়ে রাখেননি নিজের থেকে। ইংরেজ কথাসাহিত্যিক সমারসেট মমের এই কথাটি তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে খুব খাঁটি :

> The subject the writer chooses; the character he creates his attitude towards them are conditioned by his bias. What he writes is the expression of his personality and manifestation of his instincts, his emotions, his intuition and his experience. [১৮]

তারাশঙ্করের সমকালে জমিদার প্রথার অবসান হয়ে ধনতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। তাঁর জন্মভূমি রাঢ় বাংলাতেও সেই সামাজিক বিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল। রাঢ়ের মাটিতে জমিদার শ্রেণী তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছে, বণিকশ্রেণীর আবির্ভাব তারা সহজ ভাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু কালের বিবর্তনে জমিদার প্রথা ক্রমশ বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছিল। তারাশঙ্কর ছিলেন এই ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের ক্ষুদ্র এক জমিদার। জমিদার শ্রেণীর আভিজাত্য তিনি দেখেছেন এবং সেই আভিজাত্য টিকিয়ে রাখতে না পারার কষ্টও তাঁর মধ্যে ছিল। এই ভাঙা গড়ার খেলা তারাশঙ্কর তাঁর অনেকগুলো ছোটগল্পে উঠিয়ে এনেছেন যা তাঁর জীবন থেকে নেওয়া। 'জলসাঘর' গল্পটিতে বীরভূমের জাত্যাভিমানী এই জমিদার শ্রেণীর বিগত ঐশ্বর্য ধরে রাখার করুণ প্রচেষ্টা লেখক অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাঢ় বাংলার প্রান্তে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি পড়ন্ত জমিদার শ্রেণীর আভিজাত্য ধরে রাখার চেষ্টার কথা লেখক বলেছেন অত্যন্ত মমতার সঙ্গে। উঠতি ধনতন্ত্রের বিকাশও লেখক দেখিয়েছেন যেভাবে তিনি তাঁর সমকালে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার', 'রায়বাড়ি'Í এই গল্পগুলো এই পটভূমিতে রচিত।

পুণ্যবান বৈষ্ণবের পদচারণায় রাঢ়ের মাটি ধন্য হয়েছেÍ তারাশঙ্কর এমনটা ভেবেছেন। পরিচিত বৈষ্ণব বা বাউলকে অথবা বৈষ্ণবিনীকে লেখক তাঁর ছোটগল্পে শিল্পি-সত্তা দিয়ে অমর করেছেন।

'রসকলি' গল্পের মঞ্জরী তাঁর চিরচেনা বৈষ্ণবী। এভাবে 'রাইকমল', 'হারানো সুর', 'বাউল' প্রভৃতি গল্পে তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন :

> সকাল থেকে বাউল বৈষ্ণব আসতেন ভিক্ষে করতে। খঞ্জনি একতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। পদাবলীর দু-চারজন ছিলেন। শাক্ত সন্ন্যাসীও আসতেন, প্রচণ্ড জোরে হাঁক মারতেন চে-ৎ-চণ্ডী। কালী কপালী নরমুণ্ডমালী, বন্ধন কাট মা, বন্ধন কাট, মুসলমান ফকির আসতেন, বয়েৎ আওড়াতেন, তাঁদের কারও কারও হাতে চামড়ার আবরণীর উপর শিকারে পাখি (বাজ পাখিরই একটি ছোট জাত) থাকত, কেউ কেউ গান গাইতেনÍ দেশী হাতে তৈরী সারেঙ্গী জাতের যন্ত্র বাজিয়ে। গোপাল হারা মা যশোদার বেদনার গান, দেহতত্ত্বের গান। পীর মঙ্গল গাইতেন। [১৯]

তারাশঙ্কর আরও উল্লেখ করেছেন :

> দিন কয়েক পরেই এলাম একটি নিবিড় পল্লীগ্রামে। আমাদেরই মহলে। যেখানে বাসা হল, তার সামনে একটি ছায়ানিবিড়ি আখড়া, বৈষ্ণবের কুঞ্জ। গ্রামের লোকে বলে কমলিনীর আখড়া, রকিকজনে রসান দিয়ে বলে কমলিনীর কুঞ্জ। বৈষ্ণব নাই, আছে শুধু কমলিনী বৈষ্ণবী। আমি পৌঁছাবার কিছুক্ষণ পরই ক্ষারে-ধোয়া কাপড়খানি পরিপাটি করে পরে শ্যামবর্ণ মেয়েটি হাস্যমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে একখানি ঝকঝকে মাজা রেকাবিতে দু-খিলি পান, পাশে দুটি লবঙ্গ, টুকরো দুয়েক দারুচিনি, একটি ছোটো এলাচ, নামিয়ে দিয়ে হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলোÍ বললো প্রভুর জয় হোক। [২০]

আদিবাসী অধ্যুষিত রাঢ়ের অর্থাৎ বীরভূমের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ছোট বড় নানা বিষয় তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। পড়ন্ত জমিদার, উঠতি ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, বাউল, সন্ন্যাসী, শাক্ত উপাসক, নানা শ্রেণীর কৃষক, ছুতোর, কামার, মুচি, ডোম, নাপিত, বেদে, সাপুড়ে, পটুয়া, বাউরি, বায়েন, বাগ্‌দি, সাঁওতাল ইত্যাদি নানা পেশার মানুষ যারা সমগ্র রাঢ় বাংলা জুড়ে রয়েছে তারাশঙ্কর তাদের সঙ্গে আত্মিক ভাবে সম্পৃক্ত। তাই এদের কথাই বারবার স্থান পেয়েছে তাঁর গল্পগুলোতে। এই গোষ্ঠী-জীবন তাঁর স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে বারবার:

> (ক) সপ্তাহে দু তিনদিন আসত পটুয়ারা। দ্বিজপদ পটুয়াকে আজও মনে আছে। সুন্দর চেহারা ছিল তার। তেমনি গান গাইত। লম্বা পট খুলে কৃষ্ণলীলা-রাসলীলা-গৌরাঙ্গ লীলার পর পর সাজানো ছবি দেখিয়ে যেত আর গান গেয়ে যেত 'আহা,

কী মধুর লীলা রে।' পটের শেষের দিকটায় থাকত ধর্মরাজ অর্থাৎ যমরাজের দরবার। বৈতরণী নদী পার হয়ে যেতে হয় দরবারে, যেতেই হবে, না গিয়ে পরিত্রাণ নেই। .....সবশেষে ছবিটি ছিল নদীর ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী হয়ে বসে আছে নৌকা নিয়ে। দ্বিজপদ গাইতÍ ও নামের তরী বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পার করে। [২১]

(খ) ...নানা ধরনের বেদে দেখেছি। সে-কালে বছরে তিনটে চারটে দল আসতই। একেবারে বর্বর, একফালি নেংটি পরা, কালো কষ্টিপাথরের মতো দেহ, তারা আসতÍ পায়ে হেঁটে আসত, সঙ্গে থাকত কিছু গরু মহিষ, একপাল দারুণ হিংস্রদর্শন কুকুর, এসে গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় বাসা গাড়ত, প্রান্তরে শিকার করে আনত খরগোস, সজারু, ইঁদুর, গোসাপ, শেয়াল, বড় বড় ধামিন সাপ। সন্ধ্যার অন্ধকার হয় হয়, তখন তারা শিকার করে ফিরত, অস্পষ্ট আলোয় ছায়ামূর্তির মতো দেখাত, কাঁধে কাঁধে ঝুলত রাশীকৃত মৃত জন্তু, সরীসৃপ। এদের মেয়েরা গ্রামে দুপুরে ভিক্ষা করত। মাটির ঝুমঝুমি, খেজুর পাতায় বোনা থলে বিক্রি করত। দুপুরে স্তব্ধ গৃহদ্বারে হাঁক উঠতÍ এ খোকার মা, ঝুমঝুমি লিবি ? কিনলেও বিপদ, না কিনলেও বিপদ, ঝগড়া কোনক্রমে বাধিয়ে কিছু না কিছু কেড়ে নিয়ে পালাত। [২২]

(গ) আরো আসত লাঠিয়াল। প্রকাশ্য পেশায় লাঠিয়াল। গোপন পেশায় ডাকাত। এরাও বৃত্তি পেত। বৃত্তি ছাড়াও মধ্যে মধ্যে আসত, অভাব-অভিযোগ থাকলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসত পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। কিন্তু একটা বিশেষত্ব ছিল। পুলিশের অভিযোগ সত্য হলে সে ক্ষেত্রে তারা আসত না। যে ক্ষেত্রে অভিযোগ মিথ্যা, সে ক্ষেত্রেই তারা আসত। বলতÍ মিছে লাঞ্ছনা হবে হুজুর। আবার নিজেদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকলে এদের ডাকা হত। এরা আসত কাপড় গামছা লাঠি নিয়ে কাজ করে বকশিশ নিয়ে চলে যেত।

এরই মধ্যে গল্প করত। ডাকাতির গল্প। দাঙ্গার গল্প। শিউরে উঠত মানুষ সে সব গল্প শুনে। আমার রাত্রে ঘুম হত না আতঙ্কে, শুনতাম সেইসব গল্প। মনে আছে পোড়া শেখের ডাকাতির সব গল্প। পোড়া শেখ ছিল দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল, তেমনি প্রকৃতিতেও ছিল নিষ্ঠুর। ও-অঞ্চলে আর জুড়ি ছিল না। ময়ূরাক্ষীর ওপারে অবশ্য ভল্লারা ছিল। তারা আজও আছে। এই অর্ধাহার অনাহারের দিনেও তাদের মধ্যে বীর্যবান আছেন। জাতিতে অবশ্য ভল্লা নয়Í তারাচরণ হাড়ি আজও আছে। ওই ওদেরই অঞ্চলের শিক্ষায় সে গড়ে উঠেছে, তারাচরণ-বীর তারাচরণ। [২৩]

> (ঘ) মানষুড়ে মুসলমান দলটি আজ আর নেই। তাদের বংশই শেষ হয়ে গেছে। শুধু বামনি গ্রামেরই নয়, আরও কয়েকখানা গ্রামের এই অপবাদ ছিল। আমাদের গ্রামের উত্তর-পূর্বে মাইল চারেক দূরে ধনডাঙার হিন্দুদের এ অপবাদ ছিল। মাইল আষ্টেক দুরে দাশকল গ্রামের হিন্দুদের এ দুর্নাম ছিল। শোনা যায়, এইখানে যে ছিল এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক, সে একদিন রাত্রে পথিকভ্রমে হত্যা করেছিল নিজের একমাত্র পুত্রকে। ছেলে চিৎকার করে বলেছিলÍ বাবা আমি, বাবা। তার দেহখানা ঘুরিয়ে দিতে দিতে বাপ বলেছিলÍ এসময়ে সবাই বাবা বলে। আমার 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্প এবং 'দীপান্তর' নাটকের উদ্ভব এখান থেকেই। ক্রোশ অন্তর দীঘি আর ডাক অন্তর মসজিদওয়ালা বাদশাহী সড়ক এখানেই, সেই সড়কের উপরে গাছতলায় বসে এক বৃদ্ধ বীরবংশীর মুখে এই পুত্রহত্যার কাহিনী শুনেছিলাম। [২৪]

"তারাশঙ্কর তার আধা কাল্পনিক আধা বাস্তব কাহিনীতে রুক্ষ রাঢ়ভূমির গোষ্ঠীভিত্তিক জীবনের রসনালোভী জীবনযাত্রার কথা বলেছেন। তাদের ধর্মীয় জীবন, আচার আচরণ, মেলা পার্বণ, নবান্নের গান, গাজনের উৎসব, রাঢ়ের নিষ্ঠুর প্রকৃতি, ছাতিফাঁটা মাঠের নির্মম নির্জনতা, ময়ূরাক্ষীর বান– প্রভৃতি স্থানিক সত্যতা ও কিছু লৌকিক কাহিনীর মাধুর্যে রাঢ়ের লৌকিক জীবন ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপ রসে গন্ধে ভরিয়ে তুলেছেন। সাহিত্যে এ প্রচেষ্টা প্রাণপ্রদ। কিছুটা নবায়িতও তাই এ কৃতিত্ব গ্রাহ্য। চিরন্তর মর্যাদা পাবারও দাবী রাখে।" [২৫] সময়ের মাহাত্ম্য, সময় পরিবর্তনের মাহাত্ম্য লাভপুরে প্রকটভাবে প্রকাশ্য ছিল এবং এই কালান্তরের সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এই লাভপুরে জন্মানোর কারণে। তাই তারাশঙ্কর নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতেন। তিনি শ্রদ্ধাভরে লাভপুরকে স্মরণ করেছেনÍ "আমাদের সেকালের লাভপুর ব্যক্তিত্বে, আভিজাত্যে এবং যোগ্যতায়, রুচিতে এবং মহার্ঘতায়, বাংলাদেশের মহানগরীর রুচিসমৃদ্ধ পল্লীর সঙ্গে তুলনীয় ছিল। " [২৬]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় বাংলার রূপ-রস-গন্ধ আত্মীকৃত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর ছোটগল্পে লোকজীবনের বাস্তবতা এত জীবন্ত রূপ পেয়েছে। সমগ্র রাঢ় বাংলা এবং লাভপুরের মাটিকে তাঁর সাহিত্যসাধনার অন্যতম পটভূমি রূপে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার, আর তাই এই উপস্থাপন হয়েছে বৈচিত্র্যময়।

তথ্যপঞ্জিঃ

১. তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, 'আমার কালের কথা', *তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কার্তিক ১৩৮৮) পৃ ৪০০

২. 'আমার কালের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৮

৩. আমার কালের কথা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০০-৪০২

৪. শিবশংকর ঘোষ, *পুরাতত্ত্ব কৃষ্টি ও সামাজিক বিবর্তনে রাঢ়ের গোপভূম* (কলকাতা: প্রভা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৬) পৃ ১৯

৫. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড*, (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, সপ্তম মুদ্রণ, মার্চ ২০১০) পৃ ৮৮-৮৯

৬. বিনয় ঘোষ, "তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ:" *শনিবারের চিঠি*,: সম্পাদক [শ্রী রঞ্জনকুমার দাস], (তারাশঙ্কর সংখ্যা, ৩৬ বর্ষ: ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭১) পৃ ২৪৯

উদ্ধৃত : ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ঃ সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ পৃ ৪১

৭. রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা* (কলকাতা: নবার্ক, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৭) পৃ ১০৪

৮. রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮

৯. উদ্ধৃত: রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮

১০. সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্কর ঃ জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা: প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৯) পৃ ২৩

১১. করুণাসিন্ধু দাস, *'তারাশঙ্করের বাকশিল্প : উপাত্ত ও নির্মাণে'*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে* (কলকাতা : প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৫) পৃ ৩১৭

১২. Treatise on the Novel (London: Jonathan Cape 1965) Page-43

উদ্ধৃত: সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১

১৩. *বাংলা গল্প বিচিত্রা*, পৃ: ১১৪; উদ্ধৃত: সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রাগুক্ত পৃ ১০২

১৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা বিচিত্রা*, পৃ ১১২-১১৩, উদ্ধৃত : সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০

১৫. 'তারাশঙ্করের প্রিয় গল্প: ভূমিকা'; উদ্ধৃত: সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ ১১১

১৬. A Treatise on the Novel, প্রাগুক্ত, P: 431; উদ্ধৃত: সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯-১২০

১৭. 'আমার কালের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪৮

১৮. উদ্ধৃত: শান্তনু পাল, *তারাশঙ্করের ছোটগল্প: বিষয় ও আঙ্গিকরীতি* (কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১১) পৃ ৫৭

১৯. *তারাশঙ্কর স্মৃতি কথা* (কলকাতা: ১৩৮৭) পৃ ২৮-২৯, উদ্ধৃত: মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ* (ঢাকা : প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯) পৃ ৯৬

২০. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন* (পশ্চিমবঙ্গ : ১৯৯৭) পৃ ১৬-১৭

২১. 'আমার কালের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৭-৪৩৮

২২. 'আমার কালের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪০

২৩. 'আমার কালের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬০

২৪. 'আমার কালের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৩

২৫. সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ ১২০

২৬. 'আমার কালের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাঢ় বাংলার লোকজীবন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপিতমহ রামচন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিবাহের সূত্র ধরে বিভিন্ন স্থানে যেতে হত বলে তাঁকে 'উড়িয়া ব্রাহ্মণ' বা 'উড়ে কুলীন' বলা হত। বীরভূমের লাভপুরে একটি আদি ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহ করে সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এভাবেই লাভপুরের সঙ্গে তারাশঙ্করের পূর্বপুরুষের সম্পর্কের শুরু। লাভপুরের ব্রাহ্মণকন্যা উমারাণীর সন্তান দীনদয়াল, এই দীনদয়ালের দ্বিতীয় স্ত্রী মানদাসুন্দরীর গর্ভে তারাশঙ্করের পিতা হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। হরিদাস, প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর প্রভাবতীকে বিবাহ করেন এবং হরিদাস-প্রভাবতীর দ্বিতীয় সন্তান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর লাভপুরের ক্ষয়িষ্ণু এই জমিদার পরিবারের সন্তান এবং লাভপুরের মাটি, জলবায়ু, মানুষ সবই ছিল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক উপাদান। নিজ গ্রাম লাভপুরকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। জমিদার বংশের হলেও লাভপুরের লোকজ জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল লেখকের। তাঁর সাহিত্য-কর্মে এই অন্ত্যজ, ব্রাত্য আদিবাসীদের লোকজীবন স্থান করে নিয়েছে।

লোকজীবন এবং লোকজীবন সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি

লোকজীবন বলতে প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত, নাগরিক, অভিজাত বলয়ের বিপরীত কোটিভুক্ত সাধারণ জনজীবনকে বোঝায়। লোকবিজ্ঞানের ভাষায় :

> Collectively speaking 'Folk' means the masses of the people of the lower culture in any homogeneus social group as contrasted with the individual or with any selected class, in people bound together by ties and races, languages, religion etc. [১]

এখানে 'people of lower culture' সমাজের নিচু তলার জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। লোকজীবনে লোক হল বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যাদের গোষ্ঠীচরিত্র নির্ধারিত এবং যারা ঐতিহ্য, সভ্যতা, চারু-কারুশিল্প, পুরাণ, প্রথা এগুলোকে বংশ পরম্পরায় বজায় রাখে বিশেষ রূপে। নৃতাত্ত্বিক অভিধানে Folk বা লোক সম্পর্কে বলা হয়েছেÍ æFolk in ethnology is the common people who share a basic store of old tradition." [২]

এই সংজ্ঞার্থটি সংক্ষিপ্ত এবং কিছুটা গতানুগতিক। অপর একটি নৃতাত্ত্বিক অভিধানে লোক এর তিনটি অর্থ পাওয়া যায়। যেমন :

a. Group of associated people- সমস্বার্থে সংহত জনগোষ্ঠী
b. Primitive kind of post-tribal social organization – উপজাতি-উত্তর একপ্রকার সমাজ-সংগঠন
c. The lower classes or common people of an area-একটি অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর অথবা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। [৩]

লোকসমাজ ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ। এ্যালান ডাণ্ডিস লোক সম্পর্কে বলেন :

> The term 'Folk' can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor. It does not matter what the linking factor is-it could be common occupation, language or religion - but what is important is that a group from for whatever reason will have some traditions which it calls its own. [৪]

লোকজীবনে লোকসংস্কৃতিই বিদ্যমান থাকে। প্রাচীন যুগে আদি অধিবাসীরা ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিল। অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত ছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড় মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠী। বস্তু পূজাকে এরা ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। উত্তরকালে সমাজব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন জনপদ গড়ে ওঠে, যেমনÍ বঙ্গ, রাঢ়, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল, তাম্রলিপ্তি, পুণ্ড্র, সুহ্ম ইত্যাদি। বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্রÍ এই তিনটি জনপদই পরে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এসব জনপদে ধীরে ধীরে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে, জীবন হয়ে ওঠে সংস্কৃতিময়, বর্ণিল। লোকজীবনে ধর্মের বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। দৈবনির্ভর বাঙালির লোকজীবনে বহু তত্ত্ব, নীতি, শাস্ত্র, সংস্কার, কুসংস্কারের উদ্ভব হয়েছে। এই ধর্মপ্রাণতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় প্রকৃতির ওপর নির্ভরতাকে ; কৃষি নির্ভর জীবনে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ঝড়, ব্যাধি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে অসহায় মানুষ অধিকতর ধর্মভীরু হয়েছে ।

লোকজীবনের উল্লেখযোগ্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল লোকজীবন রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। রাজনীতির ব্যাপারগুলো সমাজের উপরের দিকের জনগোষ্ঠীর, নিম্নবর্গীয়রা এসবের আওতার বাইরে

থাকে। লোকজীবনের সঙ্গে শ্রমের গভীর সংযোগ রয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ যুগ যুগ ধরে নিজস্ব ঐতিহ্য ধরে রাখে। এরাই লোক (Folk); এরা ব্যক্তির সুবিধা বা লাভের পরিবর্তে সমষ্টির কল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। এই লোকজীবনের বিশ্বাস-সংস্কার লোকাচারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লোকসংস্কৃতির জগৎ বিচিত্র ও ব্যাপক। লোকজীবনের ধর্ম, শিক্ষা, পেশা, আচার-আচরণ, সংস্কার-কুসংস্কার, ধ্যান-ধারণা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানÍ এসব নিয়েই লোকসংস্কৃতি। সংস্কৃতি প্রধানত দুটি ধারাভুক্ত। এক, নগরসংস্কৃতি ও দুই, লোকসংস্কৃতি। বাংলাদেশের পরিমণ্ডলে সংস্কৃতির ধারা তিনটি: নগরসংস্কৃতি, গ্রামসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি। গ্রামীণ ও আদিবাসী সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। লোকসংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় লোক সমাজের জীবনাচারণে, লোকাচারে, লোকবিশ্বাসে আর সংস্কারে। পালা-পার্বণ–বিয়ে–মেলা–নবান্ন–প্রাত্যহিক জীবনানুষঙ্গ, পোষাক-পরিচ্ছদ-খাদ্য সবকিছুর সংমিশ্রণে লোকসংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করে। "বাঙলার লোকসংস্কৃতি বঙ্গজনপদবাসীর যৌথ জীবন চর্চার এক আন্তরিক ভাষ্য। সমন্বয়, সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যের এক অপূর্ব নিদর্শন বাঙলার এই লোক-সংস্কৃতি। ইতিহাস-পূর্বকালের বঙ্গ-জনপদের আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাস-সংস্কার ও লোকাচারকে কেন্দ্র করেই এই লোকসংস্কৃতির জন্ম।" [৫]

লোকসংস্কৃতি মননশীল নয়, কৃত্রিম নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এসব লোকসংস্কৃতি অধিবাসীরা বিনা দ্বিধায়, বিনা বিচারে গ্রহণ করে। "লোক-সংস্কৃতি স্থূল, সরল, অমার্জিত, গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন। যথাযথ শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাব এর অন্যতম কারণ। লোকচর্চায় যত্ন ও শ্রম কম। লোকে সহজ প্রবৃত্তির বশে উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে অনায়াসে যা পায় তাই গ্রহণ করে।" [৬] বাংলাপিডিয়া অনুসারে "লোকসংস্কৃতির অজস্র উপাদানের রূপ-প্রকৃতির বিচার করে একে চারটি প্রধান ধারায় ভাগ করা হয়: বস্তুগত (material), মানসজাত (formalised), অনুষ্ঠানমূলক (functional) এবং প্রদর্শনমূলক (performing)।" [৭] এটিএম কামরুল ইসলাম লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে বলেছেনÍ "লোকসংস্কৃতির লক্ষণ পাঁচটি: (১) ঐতিহ্যগত; (২) শ্রুতি ও অভ্যাস নির্ভর; (৩) সংঘবদ্ধ সমাজের সৃষ্টি; (৪) অভিন্ন বিশ্বাস, সংস্কার ও লোক-ভাষায় আবদ্ধ; ও (৫) লৌকিক জীবন পরিবেশে সৃষ্ট।" [৮] লোকসংস্কৃতির বিষয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) আগ্রহ ছিল অসীম; তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি লোকসংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই সজাগ ছিল। তাঁর 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধের কিছু বক্তব্য থেকে লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুসন্ধিৎসু মন দেখা যায়:

> আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnologyর বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পুর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কতবড় একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছেI পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু, জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। ...
>
> সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। [৯]

প্রাচীনকালে রাঢ়, গৌড়, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ, উত্তর-পূর্ব বঙ্গ প্রত্যেক জনপদই পৃথক পৃথক দেশের মতো ছিল। বাংলার মানুষকে সবাই কোমল, নম্র, শান্ত স্বভাবের বলে মনে করত। অঞ্চল ভেদে এই স্বভাব অবশ্য পরিবর্তন হয়। যেমন রাঢ় বাংলার রুক্ষ প্রকৃতির কারণে সেখানকার মানুষের স্বভাবও রুক্ষ হয়ে থাকে। "বাঙালি মেয়েদের সম্পর্কে বাৎস্যায়ন বলেছেন যে, তাঁরা প্রেমভাবাপন্ন, নম্র এবং কোমল স্বভাবের। অপরপক্ষে, রাঢ় দেশের লোকদের কেউ কেউ আবার রূঢ় বলে উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের সংস্কৃত কবি কৃষ্ণ মিশ্র, ধোয়ী ও রাজশেখর এবং বাংলা ভাষার কবি মুকুন্দুরাম ও ঘনরামের লেখা থেকে রাঢ় অঞ্চলের লোকদের রুক্ষ চরিত্রের আভাস পাওয়া যায় ।" [১০]

রাঢ় বাংলার লোকসম্প্রদায়

বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী এবং পৃথক পৃথক সামাজিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী লোকসম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত। লোকসম্প্রদায়ের ধর্মীয় মতামত ও সংস্কার-সংস্কৃতি মূল ধর্মাবলম্বীদের (হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান) থেকে আলাদা। মূল ধর্ম থেকে এদের উদ্ভব হলেও ধর্মীয় শাস্ত্র মান্য না করে তারা স্বাধীন ধ্যান-ধারণা পোষণ করে এবং সেভাবেই জীবন যাপন করে। বীরভূমে উনিশ শতক জুড়ে আদিবাসী ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছে। আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা এখানে কম নয়। বেদে, পটুয়া, গোপ, সদ্‌গোপ, মালাকার, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, বাউল, বেদে, বাগ্‌দি, বাউরি, মুচি, মল্ল, কোনাই, হাড়ি, সুনরি, ডোম, সাঁওতাল, কোরা, কাহার,

চাষী, লাঠিয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন লোকসম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ লোকায়ত ঐতিহ্য নিয়ে রাঢ় বাংলায় ছিল এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এরা গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। এই নিম্নবর্গের সংখ্যাও কম ছিল না। সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রদত্ত নিচের পরিসংখানে সেই সংখ্যা উপস্থাপন করা হল :

West Bengal District Gazetteers, Birbhum, 1975, অনুসারে ১৮৭২ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত এই অঞ্চলের বিভিন্ন অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সরকারী পরিসংখ্যান নিম্নরূপ–

সাল	**১৮৭২**	**১৯০১**	**১৯৩১**	**১৯৬১**
মোট জনসংখ্যা	৮৫১২৩৫	৯০৬৮৯১	৯৪৭৫৫৪	১৪৪৬১৫৮
বাগ্দী	৫৬০৯৪	৮৮৩৪২	৮৭৫১৯	১০১৩৮৪
বাউরী	২৪৫৬৯	৩৬২৩৫	৩৬৯৯৮	৪১১৯৩
মুচি	–	৪১২৮২	৪৫৩৯৫	৫৬৬৮৮
মল	৯৩৪৬	৩৮৬৯৭	৪০৯৯৯	৫০৩৮৪
কোনাই	–	১৫৫০০	১৪৩৯৪	১৭৭৬৭
হাড়ী	২১৭৫১	২৭৬৩৪	২২৩২১	১৬৪৪০
সুন্‌রী	–	১৬৯৪৮	১৪২২৬	১৪২১১
ডোম	৩৪৪৯৭	৪০৬৬৬	৩৬২৭৮	৩৮৮৫২
সাঁওতাল	৬৯৫৪	৪৭২২১	৬৪০৭৯	৯৩৪২৬
কোরা	৩৭৭৬	১১২০২	৮৯৯৩	৫৫১৪

[১১]

তারাশঙ্কর বিচিত্র পেশাজীবী এসব মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাদের জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। এই আগ্রহ থেকে তাঁর সাহিত্যে তিনি এসব সম্প্রদায়ের লোকজীবনকে উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে রাঢ়ের বিভিন্ন লোকসম্প্রদায়ের পরিচয় তুলে ধরা হল।

বেদে

বেদে সম্প্রদায় সম্পর্কে তারাশঙ্করের কৌতূহল ছিল প্রচুর। তাঁর স্মৃতিকথায় জানা যায়:

> বেদিয়ারা আসত। দেশী বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়, মাঠে আল-কেউটে ধরতে। গ্রামে সাপ দেখিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদরও নাচাত, আর চলত। ওরা যেতÍ মেদিনীপুর পর্যন্ত। তাদের মুখেই শুনেছিলামÍ মেদিনীপুর অঞ্চলে কবিরাজ ছিলেন অনেক, তাঁরা কালো কেউটের বিষ কিনতেন এবং তা দিয়ে ঔষুধ তৈরি করতেন। কালো কষ্টিপাথরের মত এদের গায়ের রঙ, তেমনি কি ছিল চুলÍ পুরুষদের দাড়ি-গোঁফের এমন প্রাচুর্য্য যে ভারতবর্ষের যে কোন শ্মশ্রুগুম্ফগরবীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। মেয়েদের চুলও ছিল তেমনি – রুক্ষ কালো ঘন এক রাশ চুল, বৈশাখের হাওয়ায় ফুলতে থাকত দ্রুত ধাবমান কালো মেঘের মত। তেমনি টিকালো নাক, আর তীক্ষ্ম চোখ। ..... এই বেদেরা আশ্চর্য। এরা তাড়া ক'রে ধরে এই সব সাপ। দেখেছি, বেদের মেয়ে বর্ষার ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে ছুটে চলেছে। আশ্চর্য হয়েছিÍ কি ব্যাপার! তারপরই দেখেছি প্রকাণ্ড একটা কেউটের মুখ মুঠিতে ধ'রে অন্য হাতে লেজটা টেনে ধ'রে আক্রোশভরে সাপটাকে বলছে– আমার হাত থেকে, যমের হাত থেকে তু পালাবি? মাত্র হাত দেড়েক লম্বা একটা পাচনি ছড়ি হাতে নিয়ে– সদ্য ধরা সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু দুলিয়ে নাচাতে দেখেছি, গাইতে শুনেছিÍ ' ও লাগিনী ফুঁসিস না। ' [১২]

বাংলায় সাপ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা আদিম বিশ্বাস–জাত। সাপের দেবী মনসা বহু পূজিত লৌকিক দেবী। সাপ সম্পর্কিত বহু ব্রতকথা, উপকথা, অভ্যাস, পেশা, লৌকিক বিশ্বাস তারাশঙ্করের ছোটগল্পে পাওয়া যায়। "সর্প-অভিপ্রায় (Snake Motif) সমস্ত পৃথিবীর একটি অতিপ্রচলিত লৌকিক সংস্কৃতির প্রধানতম বিষয়, পৃথিবীর বহু আদিবাসীর মধ্যে সর্প অভিপ্রায় আছে।" [১৩] 'বেদেনী' 'নারী ও নাগিনী', 'বেদের মেয়ে', 'যাদুকরী' প্রভৃতি গল্পে বেদেদের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'বেদেনী' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এরা নিজেদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিলেও এদের নাম-আচার হিন্দুদের মতো। হিন্দুদের ব্রত পালন করে, হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করে। সাপ ধরে, সর্পদংশনের ঔষধ বিক্রি করে, সাপ-বাঁদর দিয়ে খেলা দেখিয়ে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। সাপুড়ে-বেদের কথা আছে 'নারী ও নাগিনী'তে। সাপুড়ে বেদেদেরই একটি শ্রেণী। মেটেল, মাল, মাঝি, বিষবেদে এই বিভিন্ন প্রকার বেদেদের কথা তারাশঙ্করের অন্য কিছু রচনায় পাওয়া যায়। বিষবেদেরা সর্পদংশিত ব্যক্তির চিকিৎসাও করে, সাপের বিষ নির্গত করে কবিরাজের কাছে বিক্রিও করে। এই বেদে শ্রেণী যাযাবর, কোনো স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে :

In Western Bengal and adjoining Bihar along the Jumna and in Oudh resides another caste partly of settled and partly of nomadic habits. It is the Bediya caste (43,412 in 1961) 4,380 of the Bediyas are returned as belonging to the scheduled castes, while the rest is returned as a scheduled tribe. The caste is split into various functional sub sections. Some of these specialise as acrobats and conjures, others as hunters and fowlers, while quite a few earn their living as snake charmers. The more respectable members of the caste have settled down as cultivators. The Bediyas uppers to be a vagrant offshoot of the matter tribe and thus belong probably to the Dravida - Speaking group of tribals in north eastern central India. In present times the Bediyas also carn their living as makers of fish-hooks and articles such as combs, needles, thread and type; other make anklets, bracelets and necklets of Zinc, or sell jungle medicines. In the north they have a bad reputation for thieving. They are Hindus. Some of them have been converted to Islam, but the Mohammedans do not accept them fully. Socially they are a very impure Hindu caste. [১৪]

বাজিকর

তারাশঙ্কর বেদে সম্প্রদায়ের মতো আরেকটি যাযাবর শ্রেণী তাঁর ছোটগল্পে উপস্থাপন করেছেন, এরা হল বাজিকর গোষ্ঠী। 'আমার কালের কথায়' এদের কথা তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেনÍ

আর এক দল দেশী যাযাবর আমাদের দেশে আছে। আমাদের অঞ্চলে বাজীকর বলে। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়। পুরুষেরাও ঢোলক বাজিয়ে গান গায়। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এরা গান বাঁধে। মনে আছে ছেলেবেলায় শুনেছি Í

ও – মহারানীর মিতু হ-ই-ল।

ও – বড়লাট ছোট লাট কাঁদিতে বসিল।

এদের কাছেই খুদিরামের ফাঁসীর গান শুনেছিলাম। ওরা বলেছিল– আমাদের বাঁধা গান।

ও – বিদায় দে মা – ফিরে আসি।

এদের মেয়েরা কিন্তু অদ্ভুত। বেশভূষায় এমন বিলাসিনী যে দেখবামাত্র মনে হয় ওরা নৃত্যব্যবসায়িনী নটী। গায়ে গিল্টির গয়না, পাছাপাড় শৌখিন শাড়িÍ দেহের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে প'রে, নাকের নথ দুলিয়ে, ভুরু টেনে, হেলে দুলে, সুর করে কথা বলে

> গৃহস্থের দোরে এসে দাঁড়ায়Í ভিক্ষে পাই মা, সোনাকপালী, স্বামী সোহাগী, চাঁদবদনী, রাজার রানী ! কোমরে হাতের কনুই দিয়ে ধ'রে রাখে একটা ঝুড়ি। ঝুড়িটা রেখেই বলেÍ নাচন দেখাই মা, দেখ। ব'লেই আরম্ভ ক'রে দেয়, দুই হাতে তুড়ি মেরে, দেহখানি নৃত্যদোলায় দুলিয়ে দিয়ে গান ধরে। [১৫]

এই বক্তব্যে বাজিকর শ্রেণীর পোষাক, সাজসজ্জা, নাচ, গান সবকিছুই স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। এই বাজিকর শ্রেনী রাঢ় বাংলার লোকায়ত জীবনের একটি অংশ। 'নারী ও নাগিনী', 'যাদুকরী', 'বেদেনী', 'সাপুড়ের গল্প', 'মরুর মায়া', 'পিঞ্জর', 'যাদুকরের মৃত্যু', 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলী' প্রভৃতি গল্পে লেখক সাপুড়ে বেদে, বাজিকর, যাযাবর শ্রেণী, বাজি বা সার্কাস প্রদর্শনকারী প্রভৃতি গোষ্ঠীর জীবনাচরণ প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যাযাবর শ্রেণীর লোকজন বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করত। ক্ষণস্থায়ী জীবনে এরা কেউ কৃষিকাজ করত, কেউ কেউ দৈহিক কসরত প্রদর্শন করত, কেউ কেউ ভেল্কিবাজি, শিকারও করত। স্থায়ী কোন ঘর ছিল না বলে তাদের হাঘরে বলে চিহ্নিত করা হত। এই হাঘরে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ শ্রেণী রাঢ় বাংলায় তারাশঙ্করের সময়েও ছিল। ১৯৯৪ সালের লাভপুরের রেললাইনের ধারেও তাদের দেখা গিয়েছে।

বাউল, বৈষ্ণব, শাক্ত

অপ্রধান ধর্মাবলম্বীদের গ্রামীণ পটভূমিতে লোকসমাজের অন্তর্গত হিসেবে ধরা হয়। বৈষ্ণব, বাউল, শাক্ত এসব গোষ্ঠীবদ্ধ শ্রেণীকে লোকায়ত গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা হয়। এরা কৃষি নির্ভর নয়, ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। অপরদিকে শাক্তরা কৃষিকর্ম বা কুটির শিল্পে নিয়োজিত থেকে কিংবা সন্ন্যাসী হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এরা ধর্ম-সম্পৃক্ত প্রথা মেনে চলে। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেনÍ "বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি, সে শক্তি বলরূপিনী নয়। বৈষ্ণবরা ভগবানের সঙ্গে জগতের দ্বৈত বিভাগ স্বীকার করেছেন। শাক্ত ধর্মের মত বৈষ্ণব ধর্মে ভেদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। তাঁরা এই ভেদকে নিত্য মিলনের উপায়রূপে স্বীকার করেছেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত উপাসকের বিশ্বাস, সংস্কার ও পূজা পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও রাধাকেই উপাসনা করেন; শাক্তদের উপাস্য হলেন কালী, তারা, মহাবিদ্যা, দুর্গা, অম্বিকা, চণ্ডিকা। বৈষ্ণবদের কাছে সাধনার উপকরণ হল তুলসীবৃক্ষ, তুলসীপত্র ও তুলসীমালা। বিপরীত দিকে শক্তি সাধকেরা বিল্বপত্র, বিল্ববৃক্ষ, রুদ্রাক্ষ মালা ও জবাকেই গ্রহণ করেছেন। উভয়ের মধ্যে হিংসা-অহিংসার জীবনদর্শনগত পার্থক্য তো আছেই। " [১৬] সত্যবতী গিরি এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> তারাশঙ্করের ব্যক্তি–চেতনায় শক্তি আর বৈষ্ণবীয় ভাবের যে সহাবস্থান তাঁর পারিপার্শ্বিকের ভূগোল আর ভূমিলগ্ন মানুষের সাহায্যেই গড়ে উঠেছিলÍ তারই প্রতিফলন তাঁর কথাসাহিত্যে। রাঢ়ভূমির বিচিত্র লোকায়ত জীবনের যে পূর্ণবৃত্তটি তাঁর শিল্পীসত্তার দর্পণে ধরা পড়েছে তারই একটি দিক বৈষ্ণবীয় জীবনসাধনা আর শক্তি–উপাসক ও উপাসনা প্রসঙ্গ। [১৭]

তারাশঙ্কর 'রাইকমল' উপন্যাসের তৃতীয় মুদ্রণে উপন্যাসের প্রারম্ভে রাঢ়ভূমির কেন্দ্রবিন্দুকে বৈষ্ণব সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। বৈষ্ণবরাই বোষ্টম হিসেবে পরিচিত হয়েছে পরবর্তীকালে। ব্রাহ্মণদের কাছে এরা অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ্য রীতি-নীতি এরা মান্য করে না। বিবাহ বর্হিভূত যৌন সম্পর্ক বৈষ্ণবদের কাছে অবৈধ নয়, স্বাভাবিকভাবে এসব তারা গ্রহণ করে। মালাচন্দন বা কণ্ঠীবদল করে এরা বিবাহ করে। সামাজিকভাবে অবৈধ সন্তানকেও তারা স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। নিচজাতের জনগোষ্ঠীর বৈষ্ণব ধর্ম অনুসরণ বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত তালিকা :

জাতি	**ধর্ম**
বাইতি	প্রধানত বৈষ্ণব
ভুইমালী	কৃষ্ণ উপাসনা
ধোবা	প্রধানত বৈষ্ণব
দোয়াই	বেশিরভাগ বৈষ্ণব
ডোম	রাধাকৃষ্ণ উপাসনা
গনরি	প্রধানত বৈষ্ণব
জালিয়া কৈবর্ত	প্রধানত বৈষ্ণব
মালো	–
কাওড়া	প্রধানত বৈষ্ণব
পোদ	বেশিরভাগ বৈষ্ণব
শুঁড়ি	চৈতন্য উপাসনা
তিয়ার	বৈষ্ণব

[১৮]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শাক্ত হলেও বীরভূমের অনেক বৈষ্ণব তীর্থস্থানও প্রত্যক্ষ করেছেন। জয়দেব কেন্দুলি, চণ্ডীদাস–নানুর, বিল্বমঙ্গল–বেলুরিয়া, নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্রাগ্রাম, বীরচন্দ্রপুরÍ সবই

রাঢ় অঞ্চলের। "কেঁদুলির রাধাবিনোদ মন্দিরকে কেন্দ্র করে পথের দুধারে প্রায় বৃত্তাকারে মেলা বসে।..... কেঁদুলির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল অবশ্য বাউলদের সমাবেশ।" [১৯] বৈষ্ণবদের বাসস্থান হল আখড়া। সাধু সন্ন্যাসীদের সাধনভজনের স্থান বোঝাতে আখড়া শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু তারাশঙ্করের ছোটগল্পের আখড়া একেবারেই বৈষ্ণব গৃহস্থের বাড়ি। এরা বেশিরভাগই জাতিতে সদ্‌গোপ, নিম্নবর্গের মানুষ। একতারা–খঞ্জনি বাজিয়ে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা গান করে। মালা-তিলক পরে, রসকলি আঁকে, বিনয়ী আচরণে হাত জোড় করে ভিক্ষা প্রার্থনা করে গৃহস্থের কাছে। বোষ্টমদের মধ্যেও জাত বোষ্টম এবং ভেকধারী বোষ্টম রয়েছে। জাত বোষ্টম বা বৈষ্ণব হল যারা বংশ-পরম্পরায় বৈষ্ণব। আর অন্য জাতি বা গোত্র থেকে বৈষ্ণব হলে তাকে ভেকধারী বৈষ্ণব বা বোষ্টম বলা হয়। বৈষ্ণবরা নিজেদের মধ্যে এই জাত বিভাজন মেনে চলত। জাত বৈষ্ণবরা ভেকধারী বৈষ্ণবের সঙ্গে বিবাহসূত্রে সম্পর্ক করতে চাইত না।

গোঁড়া ও জাতিবাদী বৈষ্ণবদের বিরোধিতা সূত্রে সহজিয়া নামে এদেরই আরেকটি গোষ্ঠী উদ্ভূত হয়। আঠারো শতকের শেষভাগে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় বাউলদের উদ্ভব হয় এই সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রভাবে। আদি বাউল ধর্মের উদ্ভবের একটি ক্রম দেওয়া হল : [২০]

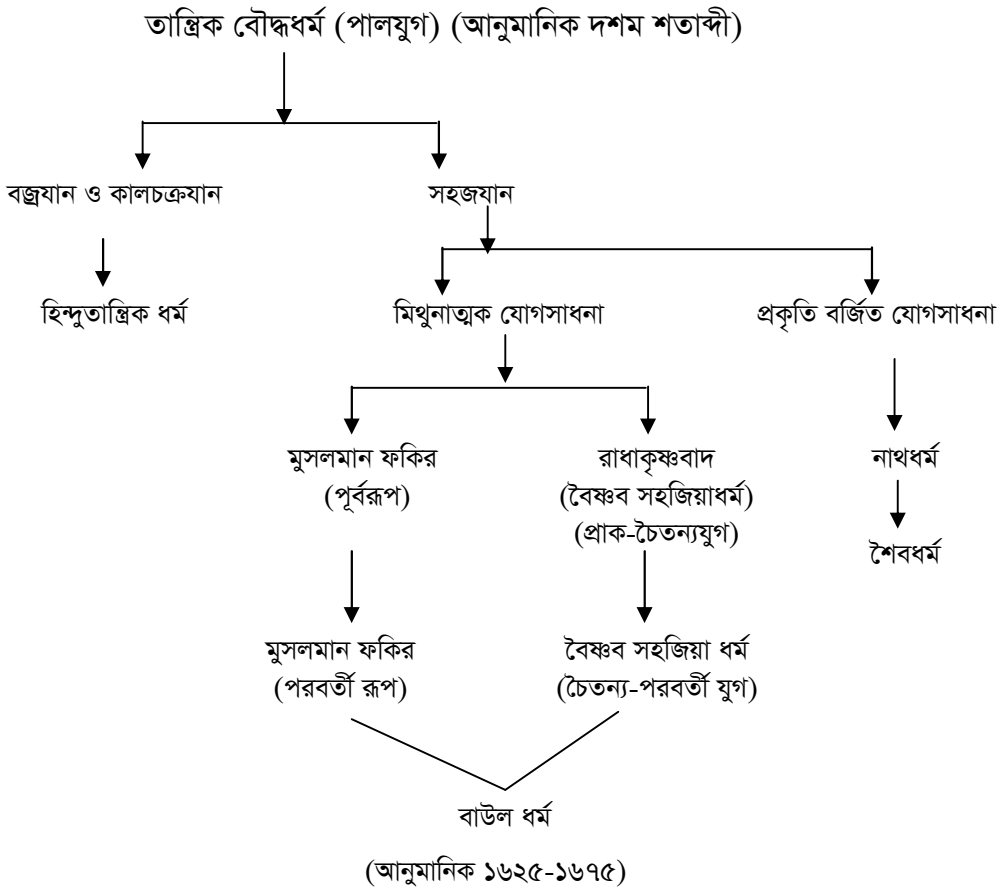

বাংলার লোকসম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত হল বাউল সম্প্রদায়। বাউল ধর্মে গুরুবাস ও দেহতত্ত্বের কথা রয়েছে। সাধারণত বাউলরা গেরুয়া বসন পরে, চুল-দাড়ি বড় করে রাখে এবং ভিক্ষা করে জীবন চালায় করে। গান গাওয়া এবং গান রচনা করাÍ দুটোই তাদের ধর্ম সাধনার অংশ। বাউলরা প্রথাগত ব্রাহ্মণ্য বা কোনো ধর্মীয় অনুশাসনের পরিবর্তে মানবতার ধর্ম গ্রহণ করে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা মানুষের শ্রেণী বিভাজন মেনে নেয়নি, থেকেছে সর্বসংস্কারমুক্ত; তাই নিম্নশ্রেণীর মানুষকে জড়িয়ে ধরা বা ডোম, মুচি এদের হাতে খাওয়ার ব্যাপরে সংকোচ ছিল না। বৈষ্ণবীয় উৎসবে বাউলদের সমাগম হয় প্রচুর। বাউলরা জীবিকা হিসেবে গানকেই অবলম্বন করে নিয়েছে। আখড়াধারী, ভিক্ষাজীবী, গৃহীÍ সবধরনের বাউলই লোকায়ত সমাজের অন্তর্গত।

শাক্ত সমাজে বা তান্ত্রিক সাধনায় আত্মার চেয়ে দেহের প্রাধান্য বেশি থাকে। লোকায়ত সমাজের শাক্তরা তথা তান্ত্রিকেরা মনে করেন যে দেহ ছাড়া আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। এদের মধ্যে নারীদের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। নারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করলে প্রকৃতি ক্রুদ্ধ হয় এটা শাক্তরা বিশ্বাস করে। বাংলার শাক্তরা একারণেই দেবী কালীর পূজা করে থাকে। বৈষ্ণব-বাউল-শাক্ত এই অপ্রধান ধর্মে স্থিত হয়ে থাকে অন্য ধর্মচ্যুত বা পালিয়ে আসা মানুষ। তন্ত্র সাধনায় শবসাধনা, বামাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি অনুষঙ্গ স্বাভাবিক ব্যাপার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রসকলি’, ‘হারানো সুর’, ‘রাইকমল’, ‘প্রসাদমালা’, ‘মালাচন্দন’, ‘সর্বনাশী এলোকেশী’, ‘বাউল’, ‘ট্রিটি’, ‘ছলনাময়ী’, ‘একরাত্রি’, ‘ট্যারা’ প্রভৃতি গল্পে রাঢ় বাংলার বৈষ্ণব, বাউল ও শাক্তদের লোকজীবন রূপায়িত হয়েছে।

গোপ, সদ্‌গোপ

রাঢ় বাংলার লোকায়ত জীবনের আরেকটি গোষ্ঠী হল সদ্‌গোপ। প্রাচীনকালে রাঢ় বাংলায় বিস্তীর্ণ গড়জঙ্গল এলাকায় যারা গরু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত তাদের বলা হত গো-পালক বা সংক্ষেপে গোপ সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা পরবর্তীকালে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে তাদের বলা হল সদ্‌গোপ এবং যারা শুধু গো-পালন ও দোহনের উপর নির্ভর করে তাদের নাম হয় গোপ বা গোয়ালা। বর্তমানে অবশ্য রাঢ়ের সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষিকাজ ও গরু পালন করে। কিন্তু জাতের উপাধি ও পদবীর মধ্যে দিয়ে প্রাচীন কালের গোষ্ঠীর কর্ম ও বর্ণভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। তুর্কি আক্রমণের পরেও রাঢ়ের বিভিন্ন এলাকায় উগ্র ক্ষত্রিয়, কায়স্থ কৈর্বত, ব্রাহ্মণ, বাগ্‌দি যেমন সামন্তরাজা রাজত্ব করতেন তেমনি গোপ সম্প্রদায়ও গড়জঙ্গলের গোপভূমিতে রাজত্ব

করতেন। রাজা গোপচন্দ্র তার প্রমাণ। সেই গোপ বা সদ্‌গোপ বা গোয়ালারা রাঢ়ের লোকজীবনের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রাঢ়ের কীর্তিগাথাকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। প্রকৃত পক্ষে গোপভূম ছিল বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে অরণ্যময় এক বিশাল ভূখণ্ড। ভারতের গোপ সম্প্রদায় আহীর ও পল্লব নামে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। রাঢ়ের ভিতরে পল্লব গোপদেরই আধিক্য দেখা যায়। এছাড়া গোপেরা উজানী, মধু, যাদব ও গোয়ালা ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত যারা তারা চাষা সদ্‌গোপ নামে পরিচিত হয়। সদ্‌গোপদের পদবী হল মণ্ডল বা মোড়ল।

পটুয়া

বীরভূমের পটুয়ারা অন্য এলাকার যেমন মেদিনীপুর ও কলকাতার পটুয়াদের চেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিজ্ঞজনের মতে আদিতে এরা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী নিষাদ জাতির শ্রেণী ছিল, পরে হিন্দু সমাজের নিম্নগোত্রীয় স্তরে স্থান পায় এবং কালক্রমে মুসলমান হয়। তবু এরা হিন্দুদের আচার-সংস্কার পালন করে। পূজা করে, নামাযও পড়ে, মেয়েরা শাখা সিঁদুর পরে। উনিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বীরভূমের অনেক গ্রামে বিশ ঘরের মতো পটুয়া বাস করত। পরবর্তীতেও বীরভূমের সিউড়ি, পাকুড়হাঁস, পানুড়ে, ইটাগড়িয়াতেও কিছু পটুয়ার বাস ছিল। তারাশঙ্করের সমকালীন সময়ে গৃহস্থ বধূরা পটুয়া নারীদের দিয়ে কাঁথায় নকশা করিয়ে নিত কিন্তু পটুয়ারা নিম্নস্তরের বলে তাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলত। 'কামধেনু', 'রাঙাদিদি' গল্পে তারাশঙ্কর পটুয়া শ্রেণীর জীবন অঙ্কন করেছেন। মালাকার শ্রেণীরা প্রতিমা, দেবতার মূর্তি অঙ্কন করত, নকশা করত, প্রতিমা তৈরি করত। এই শ্রেণীও রাঢ় বাংলার লোকগোষ্ঠীর ঐতিহ্যময় অংশ।

কাহার

হরিজনদের মধ্যে যারা পালকি বহন করে তাদের কাহার সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে। বাগ্‌দিদের মধ্যে যারা পালকি বহন করে তাদের বলে বাগ্‌দি কাহার, যারা করে না তাদের শুধু বাগ্‌দি বলা হয়। কাহার গোষ্ঠী পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, বিহার এলাকায় বসবাস করে। ভারবহন, চাষাবাদ, পালকি বহন, ভৃত্যের কাজ করে কাহার সম্প্রদায় জীবিকা নির্বাহ করে। হাঁসুলীবাঁকের কাছে মস্তলী ও কাদপুর গ্রামে তিনশ জন বাগ্‌দি কাহার বাস করে। কাহার জাতি অতিলৌকিক জগৎ সম্পর্কে সচেতন থাকে সবসময়। কাহারদের বিশ্বাস তাদের পাপের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা, মহামারী ঘটে থাকে।

বিশেষ গাছ, সাপ, মেঘ ইত্যাদিতে তারা দেবমাহাত্ম্য আরোপ করে। স্থানীয়ভাবে কাহার সম্প্রদায় বেহারা ও আটপৌরে দুটি ভাগে বিভক্ত। এদের সমাজ ব্যবস্থা কঠিন, নিয়ম-নিষেধের আবেষ্টনে ঘেরা। কাহার সম্প্রদায় আগে অর্থের বিনিময়ে নীলকরদের লাঠিয়াল হয়ে কাজ করত। নীলকরেরা চলে গেলে কাজের অভাবে চুরি ডাকাতি শুরু করে । কাহারদের নিজস্ব সাতটা উৎসব রয়েছে, যেমনÍ ধর্মপূজা, পৌষলক্ষ্মী, নবান্ন, গাজন, মনসাপূজা, ভাঁজো পরব, অম্বুবাচী। কোঠা বা দালান করলে মৃত্যু হয় অথবা জাত বা ধর্ম নষ্ট হয়Í এই বিশ্বাসে আস্থাশীল কাহার সম্প্রদায়।

রাঢ় বাংলার সাঁওতাল

রাঢ়ের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলায় সাঁওতাল জনসমষ্টির চার ভাগের তিন ভাগ রয়েছে। অনুমান করা হয়, ১৯৩১ সালে বীরভূমের মোট জনসংখ্যার ৭.৫ শতাংশ ছিল সাঁওতাল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল এসব সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। স্থানীয় বাঙালিদের চেয়ে সাঁওতালরা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সবল, কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু বলে কৃষি ও শিল্পকাজে শ্রমিক হিসেবে তাদের চাহিদা বেশি ছিল। রাঢ় বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অনেক অবদান রয়েছে। শান্ত ও সহিষ্ণু স্বভাবের জন্য তারা উচ্চবর্গের শোষণের শিকার হয়েছে এবং প্রতারিত হয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর পিসিমার কাছে বাল্যকালে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা শুনেছেন। নব্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে সাঁওতালরা তাদের বহু শ্রমে করা আবাদী জমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। 'শিলাসন', 'কমল মাঝির গল্প', 'একটি প্রেমের গল্প', 'ঘাসের ফুল' প্রভৃতি গল্পে সাঁওতালদের জীবন তুলে ধরেছেন লেখক।

গন্ধবণিক

বীরভূমের কীর্ণাহার অঞ্চলে এবং দামোদর ও অজয় নদের উভয় তীরে গন্ধবণিকদের বসবাস। রাঢ়ের পল্লীসমাজে তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। রাঢ় বাংলায় তুর্কি আগমনের পর গন্ধবণিকরা তুর্কিদের প্রিয় হয়ে ওঠে এবং ব্যবসা প্রসারের ফলে সমৃদ্ধি অর্জন করে। তাদের বীরভূমের রেশম ও রেশম কাপড়ের ব্যবসা ছিল। ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে গন্ধবণিকদের গৌরব হ্রাস পায় এবং এই অবনতি বীরভূমের নবাবের কারণে তরান্বিত হয়। অনেক প্রাচীনকাল থেকে রাঢ় অঞ্চলে এই গন্ধবণিকদের ঐতিহ্য রয়েছে। 'ভুবনপুরের হাট' ও 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে তারাশঙ্কর গন্ধবণিকদের কথা বলেছেন।

বাগ্‌দি, ভল্লা, লেট

রাঢ় বাংলার লোকায়ত সমাজে বাগ্‌দি, ভল্লা ও লেট গোষ্ঠী নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে অবস্থান করেছে। বাগ্‌দিরা বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমানের অধিবাসী; বীরভূমের প্রাচীনতম অধিবাসী এরা। চাষবাস করা, নৌকা চালানো, মাছ ধরা এদের পেশা। বাগ্‌দি শ্রেণীর মধ্যে যারা সবচেয়ে উঁচু তাদেরকে তেঁতুলিয়া বলা হয়। অতীতকালে বাগ্‌দিরা দক্ষ লাঠিয়াল হিসেবে নিযুক্ত হত এবং পেশা হিসেবে চুরি ডাকাতিকে বেছে নিত। বাগ্‌দিদের একটি শাখা হল ভল্লা গোষ্ঠী। বাইরের দিক দিয়ে ভল্লারা শান্ত হলেও একসময় তারা ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিল। দেহের শক্তি ও লাঠি চালনায় তারা পারদর্শী। বাগ্‌দিদের লেট নামে আরেকটি শাখা আছে। তবে লেটরা তা অস্বীকার করে, বাগ্‌দিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও তারা করে না। এরা জাল বোনে, মাছ ধরে, কৃষিকাজ করে, চৌকিদারি বা দিনমজুরি করে আবার কেউবা ডাকাতিও করে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে মনসা ও ধর্মরাজের পূজা করে এবং ধর্মরাজকে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমার রাতে তাড়ির ভোগ দেয়।

ডোম, হাড়ি, বাউরি

রাঢ় বাংলার জনজীবনে ডোম-হাড়ি-বাউরি এরা বেশিরভাগ সময়ে লাঠিয়াল হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করত। কাজের অভাব হলে চুরি-ডাকাতি করত। সৃহৃদকুমার ভৌমিক ডোমদের প্রসঙ্গে বলেছেন:

> সম্ভবত গোড়ার দিকে ডোমদের কাজ ছিল বাজনা বাজানো এবং অবসর সময়ে বাঁশের চুপড়ি ইত্যাদি তৈরি করে গ্রামে বিক্রয়। পরবর্তীকালে মৃতব্যক্তির জিনিসপত্র পরিষ্কার ও নগরের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত হয়। ফলে অনেকে ধাঙড় ইত্যাদির সঙ্গে অভিন্ন ভেবে এদের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মনে করেন। কিন্তু মূলত ডোমেরা কোলগোষ্ঠীর। Cold well - এর মতে দ্রাবিড়-পূর্ব জাতির ডোমরা কোলগোষ্ঠীর একটি শাখা। সাঁওতালদের বিবাহে ডোমদের বাজনার বিশেষ স্থান আছে। [২১]

ডোমদের তিনভাগের দুভাগ বাস করে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়ায়। ডোমদের মেয়েরা ধাইয়ের কাজ করে। ডোম গোষ্ঠী ঝুড়ি তৈরি করে এবং কৃষিকাজ করে। তারাশঙ্করের সময়ে লাভপুর গ্রামে হাড়ি গোষ্ঠী ছিল। হাড়িদের মধ্যে যারা ভূঁইমালী নামে পরিচিত তারা কৃষিকাজ করে এবং ফুলহাড়ি নামে যারা আছে তারা ধাইয়ের কাজ করে। বাউরিরা সাধারণত জমি-জমা চাষাবাদের কাজ করে। এরা শারীরিকভাবে অন্য গোষ্ঠীর লোকদের তুলনায় দুর্বল। গায়ের রং সাধারণত কালো হয়, শারীরিক গঠনের দিক থেকে এরা ছোটখাট এবং শীর্ণ। বাউরি গোষ্ঠীর নারীরা বাসা-বাড়িতে কাপড় কাচা,

বাসন মাজার কাজ করে। ঠ্যাঙাড়ে নামে আর একটি লোকগোষ্ঠী রয়েছে রাঢ় বাংলায়, এরা মানুষের কাছ থেকে অর্থ, অলঙ্কার, মূল্যবান সম্পদ লুটপাট করার উদ্দেশ্যে হত্যা করে নির্জন জায়গায় ফেলে রেখে যেত। ময়ূরাক্ষীর ওপারে তাদের বাস ছিল। এই ঠ্যাঙাড়ে গোষ্ঠী পূর্বে 'মানষুড়ে' মুসলমান দল হিসেবে পরিচিত ছিল।

রাঢ়ীয় জীবনাচরণ ও সংস্কৃতি

ধর্মাচরণ ও লোকউৎসব

রাঢ় বাংলায় ধর্মীয় উৎসব বা ধর্মীয় আচার-আচরণ পালিত হয় ঘটা করে। অন্নপূর্ণা পূজা ('স্রোতের কুটো' গল্পে বর্ণিত), লক্ষ্মীপূজা ('পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পে বর্ণিত), দুর্গা পূজা ('প্রতিমা' গল্পে বর্ণিত) নদী পূজা ('তারিণী মাঝি' গল্পে বর্ণিত), চোত-পরব এর গাজন ও ধর্মপূজা ('মতিলাল' গল্পে বর্ণিত), ভাঁজো উৎসব ('প্রতীক্ষা' গল্পে বর্ণিত) প্রভৃতি ধর্মীয় আচার পালন করা হয় রাঢ় বাংলায় সাড়ম্বরে। রাঢ়দেশের লৌকিক দেবতার মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজার গুরুত্ব এবং প্রাধান্য বেশী রয়েছে। "সমগ্র বীরভূম জেলার প্রায় ৭৭টি গ্রামের ২২৬টি স্থানে এখনও ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। এই ধর্মঠাকুরের সংখ্যা ১৪৩। এরা বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত প্রভাবিত। এইসব ধর্মঠাকুরের অধিকাংশের দেয়াশী বা সেবাইত ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরা।" [২২]

বীরভূম জঙ্গলময় অঞ্চল ছিল বলে সাপের আধিক্য ছিল। একারণে সাপের দেবী মনসা রাঢ় বাংলায় বহু-পূজিত। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী গন্ধবণিক সমাজে ব্যাপক আলোচিত, প্রচলিত। গ্রামীণ সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে গানের মত করে মনসামঙ্গল পাঠ করা হয়। গ্রামে মহামারী দেখা দিলে মঙ্গলা দেবীর পূজা করা হয়।

ভাঁজো নামে বর্ধমান জেলায় মেয়েদের একটি ব্রতানুষ্ঠান রয়েছে। শস্য উৎসব হিসেবে এটি পালিত হয়। ভাদ্র মাসের মন্থনষষ্ঠীতে শুরু হয়ে শুক্লা দ্বাদশীতে শেষ হয়। শুরুর দিন মেয়েরা মটর, মুগ, অড়হর, ছোলা, কলাই–এই পাঁচ রকমের শস্যদানা একটি পাত্রে ভিজিয়ে রাখে এবং প্রতিদিন স্নানের শেষে পাত্রটিতে পানি দেয়। শস্য অঙ্কুরিত হলে শুভ ইঙ্গিত ধরা হয়। ভাঁজো উৎসব বাগ্‌দি, ডোম, কাহার, হাড়ি, বায়েন এরা পূজারূপে পালন করে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ' উপন্যাসে তারাশঙ্কর এই ব্রতের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন :

> জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পূজা হয়। তার কয়েকদিন পূর্বে বাবাঠাকুর তলায় ইঁদপূজা। সেই স্থানের মাটি দিয়ে ভাঁজোর বেদী তৈরি করে লতাপাতা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। পঞ্চশস্য সংক্রান্ত মেয়েদের ব্রতপালন হয়। স্ত্রী পুরুষ মিলে সুরাপান করে সারাদিন ভাঁজোর আসরে আসরে নাচ, গান, স্ফূর্তি করে। রাতেও ঘুমানো নিষেধ। আঙিনায় আমোদ অনুষ্ঠান হয়। অঙ্কুরিত পঞ্চশস্যের সরা মাথায় মেয়েরা নদী থেকে ঘটে জল ভরে আনে। পরদিন সকালে মেয়েরা সালুক ফুলের মালা ও সিঁদুরটিপে সাজানো ভাঁজো সুন্দরীকে নদীতে ভাসিয়ে স্নান করে ঘরে ফেরে। সেদিনটাও উৎসবের রেশ বজায় থাকে। [২৩]

ইন্দ্রপূজাও প্রচলিত আছে রাঢ়ের লোকায়ত জীবনে। শালগাছকে নতুন কাপড়ে জড়িয়ে বাঁশের তৈরি ছাতা মাথায় দিয়ে গাছের তলায় ছোট বেদী তৈরি করে ঘট স্থাপন করে এই পূজা করা হয়। বৈষ্ণবীয় ধর্মাচারের ক্ষেত্রে দেখা যায় বৈষ্ণবীরা নাকে রসকলি কাটে। হিন্দু সমাজে আচারের ওপরই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। লাভপুরের পীঠস্থান ও সেখানকার দেবী চণ্ডিকা বেশ আলোচিত। বর্ধমান জেলায় অট্টহাস নামে একটি পীঠ রয়েছে। বীরভূমের কঙ্কালীতলা, তারাপীঠ, উদ্ধারণপুর, বক্রেশ্বর, লাভপুর, সাঁইথিয়া প্রভৃতি স্থানে শাক্তপীঠ ও উপপীঠের অস্তিত্ব থেকে শাক্তধর্মের প্রসারতার কথা জানা যায়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের আরেকটি বিশেষ লোকউৎসব হল অম্বুবাচী। বর্ষকালে আষাঢ় মাসের সপ্তম দিন থেকে তিনদিন এটি পালন করা হয়। হিন্দু মহিলারা এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ আচার পালন করে, পিঠা-পুলি তৈরি করে। বিধবা মহিলাদের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই তিনদিন পৃথিবী ও আকাশের মিলন হয়ে পৃথিবী সিক্ত হয় এবং এতে পৃথিবীর মাটি কৃষিকাজের উপযোগী হয়।

ধর্মবিশ্বাসে এরা মিশ্র ধর্ম পালন করে কখনও কখনও। কর্তাঠাকুর, কালরুদ্র, ফুল্লরা, ধর্মঠাকুর, শেরিনা বিবির কবর, গুল মহম্মদ ঠাকুরের কবর, সাওগ্রামের শিবনাথতলা ইত্যাদি ধর্মপ্রসঙ্গ রাঢ় বঙ্গের লোকায়ত জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

বিবাহ অনুষ্ঠান

বিভিন্ন রকম বিবাহ প্রথা রাঢ় বাংলায় প্রচলিত আছে। বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা লোকসমাজে ততটা দেখা যায় না। আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই বিনা আড়ম্বরে লোকগোষ্ঠীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বৈষ্ণবীয় সমাজে মালাচন্দন, কণ্ঠীবদল ইত্যাদি বিভিন্ন বিবাহ প্রথা রয়েছে। বৈষ্ণবীয় সমাজে মালাবদল করে বিয়ে করতে পারে। লোকসমাজে বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রচলিত। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কও নিম্নবর্গের লোকায়ত সমাজে কোথাও কোথাও দেখা যায়। আবার কোথাও জাতের মধ্যেও রয়েছে ভেদাভেদ, যেমন জাত বোষ্টম যারা তারা ভেকধারী বোষ্টমদের কাছে সন্তানদের বিয়ে দিতে চায় না।

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

লোকায়ত সমাজে সংস্কার-কুসংস্কার পাশাপাশি বিরাজিত। রাঢ়ের রুক্ষ ভৌগোলিক পরিবেশেও লোকায়ত বিশ্বাস-কুসংস্কার–সংস্কার রয়েছে। এসব বিশ্বাস কোনও কোনও সময় মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে ফেলে। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষকে খারাপ আত্মা বা সত্তা হিসেবে অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ডাইনীতে বিশ্বাস লোকায়ত সমাজে পরিলক্ষিত হয়। কোন নিঃসন্তান বা বিধবা মেয়ের দ্বারা কারও কোন ক্ষতি হলে, যদি সেটা অনিচ্ছাকৃত হয় তাহলে সেই মেয়েকে সবাই খারাপ ভাবা শুরু করে এবং পরিণতিতে তাকে ডাইনী অপবাদ দেওয়া হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দেখা ডাইনী চরিত্র নিয়ে তাঁর কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন। এছাড়াও নজর দেওয়া, ভর করা, পিছুডাক, টোটেম, ট্যাবু, তাবিজ কবচ, মাদুলি, শিকড়, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র, বাণমারা, বশীকরণÍ এসব সংস্কার যুগ যুগ ধরে রাঢ় বাংলার লোকায়ত সমাজে প্রচলিত। ঝাঁড়ফুক বা তন্ত্রমন্ত্রের ওপর লোকসমাজ অন্ধের মত বিশ্বাস করে। বেশিরভাগ সময়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই ঝাঁড়ফুক বা তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। গ্রাম্য লোকজীবনে কোন নারীকে বা কোন ব্যক্তিকে ডাইনীর প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য মন্ত্র পড়ে ঝাড়া হয়। আবার কাউকে সাপে দংশন করলে সাপের ওঝা মন্ত্র পড়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাঁড়ফুক করে। আবার কোথাও কোথাও লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি দেবতার কাছ থেকে অলৌকিকভাবে অদৃশ্য ক্ষমতা বা শক্তি লাভ করে। সামাজিক নিষেধাজ্ঞাও রাঢ় বাংলায় ছিল, একে ট্যাবু বলা হয়। ট্যাবু অনুযায়ী প্রচলিত রয়েছে যে, কোন মহিলা পুরুষের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে গেলে সন্তান লাভে অক্ষম হয়ে পড়বে। এইসব ট্যাবু লোকসমাজে নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় বেশি।

পোষাক–বাসস্থান–আহার

রাঢ় বঙ্গের লোকায়ত সমাজের পোষাক–পরিচ্ছদ, বাসস্থান, আহার ব্যবস্থা জাতি-গোত্র অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে। লোকজীবনের দারিদ্র্য সেখানকার নর-নারীর পোষাক-বাসস্থান-আহার প্রভাবিত করে। তারাশঙ্কর 'আমার কালে কথা'য় বলেছেন :

> সেকালের ঘর ছিল ঘুপচি; হয়তো চারকোণে মানুষের মাথায় চাল ঠেকত; জানালা দূরে থাক্, দরজাও সর্বক্ষেত্রে থাকত না, থাকত আগড়। একখানিই ঘর, তার একদিকে হেঁসেল একদিকে হাঁস মুরগী, মাঝখানে শুতো মানুষ। ..... সেকালে দরিদ্র পুরুষেরা সাত হাত কাপড় পরে নগ্নপ্রায় হয়ে বেড়াত, মেয়েরাও পরত তাঁতের খাটো সাড়ে আট হাত শাড়ি। [২৪]

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পোষাক-পরিচ্ছদে মলিন গেরুয়া রঙের প্রাধান্য থাকে। বৈষ্ণবী নারীদের কখনও কখনও রঙিন তসরের শাড়ি পরতে দেখা যায়। ক্ষার দিয়ে ধোয়া শুভ্র পোশাকও বোষ্টমীরা পরিধান করে। কিন্তু বেদেনী বা বাজিকরী শ্রেণীর মেয়েরা জমকালো ছাপানো শাড়ি আঁটসাঁট করে পরে, সেই পরার ভঙ্গিতেই আছে বৈচিত্র্য যা তাদের স্বতন্ত্র রূপ দেয়। বাউরি নারীদের পোষাক-আশাক ততটা ফিটফাট থাকে না এবং পোষাকের প্রতি যত্নশীল নয় তারা। চণ্ডাল শ্রেণীর লোকেরা শ্মশানের থেকে পরিত্যক্ত কাপড় সংগ্রহ করে পরে। সৌখিন শাড়ি পরতে পছন্দ করে সাঁওতাল, বাজিকর শ্রেণীর নারীরা। গহনার ক্ষেত্রে বেদেনীর হাতে থাকে রেশমি চুড়ি বা গিলটির চুড়ি, গিলটির হার, নাকফুল, বাজুবন্ধ,ঝুমকা দুল, মাকড়ি ইত্যাদি বেদেনী বা বাজিকর নারীরা পরিধান করে থাকে। তাদের পেশার সঙ্গে এসব পোষাক-সাজসজ্জা সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুরুষদের পোশাকে ততটা বৈচিত্র্য দেখা যায় না তবে সার্কাস যারা দেখায় তাদের বিচিত্র রঙিন পোষাক পরতে দেখা যায়। সৌখিনতার পরিচয় দিতে পটুয়া নারীরা কখনও কখনও নিজেদের ব্যবহার্য জিনিস সুন্দর নকশায় চিত্রিত করে। কেউ কেউ নিজের হাতে সিজুনিতে অপরূপ রূপে সুতার নকশা করে।

বাসস্থান পেশার ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। বোষ্টমী মেয়েরা তাদের ঘর তকতকে রাখে, আলপনা দিয়ে দেয়াল চিত্রিত করে। বাউলরা সাধারণত গৃহী স্বভাবের না হলেও আশ্রয়ের জন্য কোন রকম একটা আবাসস্থান যোগাড় করে থাকে। বোষ্টমদের জন্য আখড়া রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কেউ কেউ ঘর হারা হলেও পরে অন্য জায়গায় আবাস গড়ে তোলে। লোকজ জীবনে আর্থিক প্রাচুর্য না থাকার কারণে বাসস্থানে কোন চাকচিক্য দেখা যায় না বরং ক্লেদাক্ত, সংকীর্ণ আবাস স্থানই বেশি লক্ষ করা যায়।

আহার্যের ক্ষেত্রে কোনো জৌলুস বা অতিরেক লোকজীবনে দেখা যায় না। ভাত-তরকারির পাশাপাশি শুকনো খাবার, যেমন–চিড়া, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের খাবার। ভোজন বিলাসিতা রাঢ় এলাকার লোকজীবনে অনুপস্থিত। তবে তামাক, মদ, হুকো, গাঁজা জাতীয় নেশা দ্রব্য এদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। উদরপূর্তির জন্য খাবার না থাকলেও চলে, নেশার দ্রব্য তাদের অপরিহার্য। মেলা পার্বণে পিঠা, বাতাসা, চা ইত্যাদি খাবার পাওয়া যায়।

লোকগীতি-লোকনৃত্য-লোকনাট্য

রাঢ় বাংলার বেদে বা বাজিকর শ্রেণীর নারীরা গান গেয়ে নাচ করে থাকে। তারাশঙ্কর তাঁর সমকালে এসব নাচগান প্রত্যক্ষ করেছেন যা পরে তাঁর অনেক গল্পে বাস্তবসম্মত রূপ পেয়েছে। ঝুমুর নাচ, কবিগান সবই রাঢ় এলাকার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। কবিগান বা কবি-সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানা কাঁসি-সহযোগে সদলে সবলে চিৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন নাÍ তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। [২৫]

এই কবিগান রাঢ় অঞ্চলে যারা কবি ছিল তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হত এবং যারা শ্রোতা তাদের কাছে অনেক জনপ্রিয় ছিল। এই গান ছাড়াও বাজিকর শ্রেণীর নারীদের নৃত্যসহযোগে গান রয়েছে। কখনও কখনও টাকার বিনিময়ে পোশাক ছাড়া তারা নৃত্য প্রদর্শন করে দর্শকের মনোরঞ্জনও করে থাকে। বাউল নাচ, খেমটা নাচ, ঘাটু নাচ, তালে তালে লাঠি খেলা ইত্যাদি এই অঞ্চলের লোকসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়।

খেমটা নাচ-গানের প্রধান অবলম্বন রাধা কৃষ্ণের প্রেম। কোন নির্দিষ্ট উপলক্ষ ছাড়াই এই নাচ-গান করা হয়। যে কোন লৌকিক অনুষ্ঠান বা উৎসবে এই নাচ করা হতে পারে। খেমটা নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখমুখে সূক্ষ্ম কাজ এবং পায়ের জটিল গতি-ভঙ্গিমা। তালের সঙ্গে খেমটা নাচ পরিবেশিত হয়।

ঘাটু নাচ ঘাটু গানের সঙ্গে পরিবেশিত হয় লোকমনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। কিশোর ছেলেরা এর প্রধান আকর্ষণ। একজন মূল গায়েন গান গায়, আর ঘাটুপুত্ররা তার সঙ্গে নাচে। ঢোল, বাঁশী, সারিন্দাÍ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই নাচের সঙ্গে।

রাঢ় বাংলার লোকায়ত সমাজে বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হত। কৃষ্ণযাত্রা, সংকীর্তন, ভাসান প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হত। লোকনাট্যের একটি আঙ্গিক হল ভাসান। ভাসানের ঘটনা এবং চরিত্র মনসামঙ্গলের কাহিনীকে অবলম্বন করে গ্রহণ করা হয় এবং লোককথায় বা গীতাকারে প্রকাশ করা হয়। ভাসান গান পৌষলক্ষীর দিনেও গাওয়া হয়।

রাঢ় বাংলার লোকগোষ্ঠীর ভাষা

সাহিত্য-সাধনায় কল্লোলের পূর্ব পর্যন্ত চরিত্র অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার সর্বাঙ্গীণভাবে দেখা যায়নি। মুখের ভাষা দিয়ে যে চরিত্রকে সৃষ্টি করা যায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তারাশঙ্করের রচনা, উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্পেও ভাষার অপূর্ব প্রয়োগ রয়েছে। তারাশঙ্কর জন্মস্থান লাভপুরে অভিজাত শ্রেণীর পাশাপাশি লোকজীবন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং গল্পে চরিত্রের মুখের ভাষা বাস্তবের অনুরূপ করেছেন। রাঢ় বাংলার যে বিচিত্র গোষ্ঠী রয়েছে, যেমনÍ বাগ্‌দি, ডোম, জেলে, চোর, বাজিকর, বেদে, সাপুড়ে, মালাকার, ডাক-হরকরা, স্বৈরিণী নারী, বাউল, বৈষ্ণব, শাক্তÍ সবাই নিজ নিজ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাষা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। রাঢ়ীয় ভাষা এবং বাংলা ভাষার মিশেলে এখানকার মানুষ কথা বলে। রাঢ় অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করে গল্পকার আঞ্চলিক আবহ তৈরি করেছেন। তিনি 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ উল্লেখ করেছেন :

> আমার পাত্র পাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না। তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনার রচনায় বেরিয়ে আসে। [২৬]

রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা হুবহু ভাবে চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন তারাশঙ্কর, চরিত্রের সংলাপ থেকেই তাই এক একটি শ্রেণীকে চিনে নেওয়া যায়। যেমন, সাপের ওঝা খোঁড়া শেখ সাপিনীকে নাকের মিনি ('নারী ও নাগিনী' গল্পে উল্লেখিত) পরিয়ে দিয়ে সাপকে বলেছেÍ "রাগ করিসনা বিবি। রাগ করিস না। দেখ্‌ তো কেমন খুবসুরৎ লাগছে তোকে। দে তো জোবেদা, আয়নাটা দেতো। দেখুক একবার নিজের চেহারাখানা।" [২৭] রাঢ়ের ভাষাভঙ্গি দেখা যায় 'মতিলাল' গল্পেÍ "দেখবি, রেতে চেঁচাবে খিদেতে, ঘুম হবে না তোর।" [২৮] বীরভুমের উপভাষা-যোগে গ্রামীণ কথ্য ভাষার মিশ্রণ তারাশঙ্করের

গল্প গুলোতে দেখা যায়। রাঢ় বাংলার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কথ্য ভাষা শুদ্ধ বাংলা ভাষা থেকে অনেকটাই আলাদা। পেয়োজন, কেনে, নেকট, দরিদ্য, উপাজ্জন ইত্যাদি শব্দগুলো রাঢ় অঞ্চলের মৌখিক ভাষার অন্তর্গত। বীরভূমের এসব উপভাষার সঙ্গে যাযাবর শ্রেণীর ভিন্ন ভাষা যুক্ত হয়ে রাঢ় অঞ্চলে লোকগোষ্ঠীর মুখের ভাষাকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে। যাযাবর শ্রেণী হিন্দী-বাংলা ভাষার মিশ্রণে কথা বলে, আবার স্থানীয় লোকভাষায়ও কথা বলে। রাঢ় বাংলার সমাজজীবন ও সংস্কৃতি এভাবেই ধারণ করে রাঢ় বাংলার লোকজীবনের সামগ্রিক রূপ।

তথ্যপঞ্জি ঃ

১. *The Genosis of Floklore, vol VI* : N I (1967) উদ্ধৃত : সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য*, (কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৯) পৃ ১০১

২. *International Dictionary of Regional European Ethonology and Floklore, Vo.1*, Copenhagen, 1960, p 126: উদ্ধৃতঃ ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ*, (ঢাকা:বইপত্র, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৭), পৃ ১৬

৩. Charles Wirck (edited), *Dictionary of Anthropology and Folklore*, 1956, p. 217
উদ্ধৃতঃ ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬

৪. Alan Dundes, *Essays in Folkloristics*, Meerut (India), 1978, p.7
উদ্ধৃতঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭-১৮

৫. ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী, *বাঙলার লোকসংস্কৃতি: অন্তরঙ্গ অবলোকন*; *ফোকলোর*, সম্পাদকঃ মযহারুল ইসলাম, সহযোগী সম্পাদকঃ হেলাল হামিদুর রহমান, (ঢাকাঃ প্রকাশকাল, জুন ১৯৯৯) পৃ ৫৯

৬. ওয়াকিল, আহমদ, *বাংলার লোক–সংস্কৃতি*, (ঢাকা : প্রকাশকাল ভাদ্র ১৯৮১), পৃ ১৩

৭. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাপিডিয়াঃ বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, নবম খণ্ড*, ব্যবস্থাপনা সম্পাদকঃ সাহজাহান মিয়া (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩) পৃ ২২৫

৮. এটিএম কামরুল ইসলাম, *আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকসংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষা: বৈচিত্রে ও ব্যঞ্জনায়* (ঢাকা : প্রান্ত প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১১) পৃ ২০২

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', *আত্মশক্তি*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, *তৃতীয় খণ্ড* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, পুনরমুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৭১) পৃ ৫৮৭

১০. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, (ঢাকাঃ অবসর, পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১০) পৃ ৫১৬

১১. *West Bengal District Gazetteers*, Birbhum, 1975; উদ্ধৃত : সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯

১২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার কালের কথা', *তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড* (কলকাতা : দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮৮) পৃ ৪৩৮

১৩. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তারাশঙ্করের লোকসংস্কৃতি চেতনা: দুটি উপন্যাস', *তারাশঙ্কর: দেশকাল সাহিত্য*, সম্পাদক: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (কলকাতা : প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৮৪) পৃ ১৮২

১৪. *Aboriginal Tribes of India*, p 12; উদ্ধৃত : মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৯) পৃ ১৮৫

১৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার কালের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৯

১৬. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, *শাক্ত পদাবলী* (কলকাতা: রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৯৭) পৃ ১৭

১৭. সত্যবতী গিরি, 'তারাশঙ্করের কথাশিল্পে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব', *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা : প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৫) পৃ ৭৫৪

১৮. দেবী চ্যাটার্জী, *পতিত: ভারতের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী ভাবধারা ও আন্দোলনে শ্রেণী দ্বন্দ্বের উৎস সন্ধান*, অনুবাদ, সন্তোষরানা (কলকাতা: ক্যাম্প, ২০০১) পৃ-১১৩ উদ্ধৃত: মিল্টন বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫

১৯. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, চতুর্থ খণ্ড* (কলকাতা : চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭), পৃ ৪৬-৪৭.

২০. উপন্দ্রেনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, তৃতীয় সংস্করণ, নববর্ষ ১৪০৮) পৃ ২৯০

২১. সুহৃদকুমার ভৌমিক, 'প্রাচীন জাতি, স্থান ও পদবীর ইতিহাস', *মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খণ্ড*, সম্পাদক: বিনোদকুমার দাশ (কলকাতা : সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৯) পৃ ৮৭।

২২. রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, পৃ ৯৬; উদ্ধৃত : সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ ২০

২৩. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, *সপ্তম খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৯) পৃ ৩৩৭-৫০

২৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার কালের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৭

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য* (কলকাতা : পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৫২) পৃ ৭৯

২৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন* (পশ্চিমবঙ্গ : ১৯৯৭) পৃ ২৯

২৭. 'নারী ও নাগিনী', *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড*, সম্পাদক: জগদীশ ভট্টাচার্য (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০০০) পৃ ৩৭০

২৮. 'মতিলাল', *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত পৃ ৪৯০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ

(১৩৩৪ - ১৩৪৩)

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস থেকে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত যেসব গল্পে লোকজীবনের পরিচয় বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে সেই গল্পগুলো এই পরিচ্ছেদে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। রাঢ় বাংলার লোকজীবনের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে তারাশঙ্কর গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন। 'স্রোতের কুটো' গল্পে কৃষক-বাগ্‌দি-ভাসান দল, 'রসকলি' ও 'হারানো সুর' গল্পে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, 'চোখের ভুল'-এ বাল-বিধবা ও গায়ক যুবক, 'রাইকমল'-এর বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, 'মরুর মায়া' গল্পে হাঘরে শ্রেণী, 'প্রসাদমালা'-র সাধারণ গৃহস্থ পরিবার এবং পরবর্তীতে বৈষ্ণব ধর্মে স্থিত বৈষ্ণব, 'মালাচন্দন' গল্পে বিধবা বৈষ্ণবী, 'সর্বনাশী এলোকেশী'-র দাম্ভিক বৈষ্ণব, 'ডাইনীর বাঁশি'-র ডাইনী অপবাদযুক্ত নারী, 'নারী ও নাগিনী'-র সাপের ওঝা, 'তারিণী মাঝি'-র ময়ূরাক্ষী নদীর মাঝি, 'মতিলাল' গল্পে হাড়ি শ্রেণীর কদাকার সং, 'প্রতীক্ষা'-র বাউরি শ্রেণীর স্বৈরিণী নারী, 'ডাক-হরকরা'-র ডোম শ্রেণীর রানার পেশা গ্রহণ ইত্যাদি এই পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। রাঢ় বাংলার বিচিত্র লোকজীবনের বাস্তবতা তারাশঙ্করের ব্যাপক জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। লোকজীবনের অর্ন্তগত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সহযোগে প্রাসঙ্গিকভাবে লোকাচার-লোকউৎসব-পেশা ইত্যাদি পরিদৃশ্যমান এই গল্পগুলোতে।

স্রোতের কুটো

(পূর্ণিমা, আষাঢ় ১৩৩৪)

পল্লীর কৃষক হরি কোনাই-এর ছোট ছেলে গোপাল কোনাইকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পে লোকজীবনের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। গ্রামীণ জীবনের দরিদ্র কৃষিজীবীদের অবস্থা তারাশঙ্কর উঠিয়ে এনেছেন। রাঢ়ের রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাঢ়ের মাটিও অনুর্বর, রুক্ষ, শুষ্ক। নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে যেসব মাটি তৈরী হয়, সেখানকার কৃষকদের জমিতে চাষ করতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলের মাটি সুজলা-সুফলা নয়, এখানে কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে শস্য ফলাতে হয়। মাটির শুষ্কতা, অনুর্বরতা, পানির স্বল্পতাÍ এসব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার

সঙ্গে এখানকার কৃষকদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। এত কষ্ট করে ফসল ফলিয়েও কৃষকদের জীবন থেকে দুর্দশা যেতে চায়না। গল্পে গল্পকার এই চিত্র তুলে ধরেছেন :

> সংবৎসর দেহের রক্ত জল করে তার বাপ হরি কোনাই যে ফসলটা ঘরে তুলত, তার ষোল আনাই মহাজনের সুদের টানে, আর জমিদারের বাকী খাজনা দিতে চলে যেত; বেচারা গোপনেও কিছূ সঞ্চয় করবার অবকাশও পেত না, কারণ ফসল উঠবার মাসখানেক আগে থেকেই মহাজন নালিশের একটা খসড়া-আর্জির মুসাবিদা তাকে ডেকে শুনিয়ে দিতেন; আর জমিদার মাঠেই 'কয়াল' ডেকে মায় সুদ খাজনার মত ফসল বিক্রি করাতে বাধ্য করাতেন। [১]

লোকজ কৃষি জীবনের চিত্রের সঙ্গে একটি পরিবারের বংশ নির্বংশ হয়ে যাবার কাহিনী এই গল্পের মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। স্ত্রী কাত্যায়নী আর ভাইঝি গৌরী গোপালের আপনার জন। বড় ভাই রাখালের (গৌরীর বাবা) সঙ্গে তার বনিবনা হয় না। ভাইঝি গৌরীর প্রতি স্নেহবশত গোপাল রাখালের মাথাটা ফাটিয়ে দিয়েছিল কারণ রাখাল অন্ধ পাত্রের সঙ্গে তার স্নেহের ধন গৌরীকে বিয়ে দিয়েছিল গোপালকে ঠকিয়ে। রাখালকে মারার কারণে জেল হয় গোপালের কিন্তু জামিনে ছাড়া পেয়ে সে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অর্থ ধার করে। সেসব অর্থ ফেরৎ দিতে না পারার কারণে বিভিন্ন জনের সঙ্গে তার ঝামেলা হয় এবং ফলস্বরূপ আবার গোপালের দু'বছর জেল হয়। এই দুই বছরের কয়েদি জীবন কাটিয়ে সে তার স্ত্রী কাতির কাছে ফিরে আসার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। বাড়ি ফেরার পথে একজায়গায় অন্নপূর্ণা পূজার প্রসঙ্গ লঘুছলে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী কাত্যায়নী গোপালকে অভিমানের কারণে সাদরে গ্রহণ করে না, যা গোপালকে খুব আঘাত করে। সে তার ভাইঝি গৌরীর কাছে গেলে গৌরীও তাকে তাড়িয়ে দেয় রাখালকে আঘাত করেছিল বলে আর তার বিয়ে ভাঙতে চেয়েছিল বলে। কাত্যায়নী গোপালের সব অপরাধের জন্য গৌরীকে দায়ী করে। ক্রমে গোপাল আর কাত্যায়নীর ব্যবধান বাড়তেই থাকে।

গোপাল আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয়ে বাগ্‌দি পাড়ার এক ভাসানের দলে গায়ক ওস্তাদ হিসেবে রয়ে গেল। রাঢ়ের উপেক্ষিত জনসমাজ হল বীরভূমের প্রাচীনতম অধিবাসী এই বাগ্‌দি। চাষাবাদ বা অন্য চুরি ডাকাতিকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিতে বাগ্‌দিরা। গোপাল যে ভাসানের দলে যোগ দিয়েছিল সেই দলের কর্তা রাসভল্লা ছিল ডাকাতের সর্দার। ভাসান হল নাটকের দল। লোকনাট্যেরই একটি আঙ্গিক হল এই ভাসান। মনসামঙ্গলের কাহিনীকে অবলম্বন করে ভাসানের ঘটনা এবং চরিত্র গ্রহণ

করা হয় এবং গীতাকারে বা লোককথায় প্রকাশ করা হয়। পৌষ-লক্ষ্মীর দিনেও ভাসান গান গাওয়া হয়। এরকম একটি ভাসান দলে গোপাল গিয়ে আশ্রয় নিল।

রাঢ়ের লোকজীবনের এই উপেক্ষিত বাগ্‌দি সমাজে আশ্রয় নেওয়ার কারণে নিজ সমাজে গোপাল নিন্দিত হলো। তৎকালীন রাঢ় বাংলার সমাজজীবনে বাগ্‌দি শ্রেণীকে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা হত। নিম্ন এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর সমাজে গিয়ে সেই শ্রেণীর মানুষদের কাছে আশ্রয় নিলে অথবা তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা-খাওয়া-দাওয়া করলে সাধারণ বা অবস্থাপন্ন শ্রেণীর জাত চলে যেত। সেই সময়ের সমাজের বিধি নিষেধ অনুযায়ী জাত খোয়ানোরা আর পূর্বের শ্রেণীতে পূর্বের অধিকার বা সম্মান কিছুই পেত না। "কাতি খুব গাল দিলে, গ্রামের লোক ছি ছি করলে" [২] Í তারপরও গোপাল ইপ্সিত শান্তির সন্ধান পেল না। এক রাতে মাতাল হয়ে সে কাত্যায়নীর কাছে এসে আলিঙ্গন করলে কাত্যায়নীর প্রতিবাদে সুস্পষ্ট সমাজের বিধি নিষেধ :

> আমায় কি বাগ্দীর মেয়ে পেয়েছিস রে মুখপোড়া– জাত খোয়ানে চাষা ! আমায় তুই ছু'লি কি বলে? যা-না, বাগ্দীপাড়ায় যা না। [৩]

এই কথায় গোপাল চিরদিনের মতো অভিমান করে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়। এই খবরে কাত্যায়নী রায়দীঘির জলে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। গোপালের স্রোতের কুটোর মতো বহমান জীবন তারাশঙ্কর লোকজীবনের পটভূমিতে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রসকলি

(কল্লোল, ফাল্গুন ১৩৩৪)

বৈষ্ণব জনগোষ্ঠী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। লোকজীবনের মধ্যে বৈষ্ণবদের জীবন তাদের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে প্রত্যক্ষ রূপে ফুটে উঠেছে। 'রসকলি' গল্পে রামদাস বৈষ্ণবের ভাইয়ের ছেলে পুলিন, সৌরভ বৈষ্ণবীর মেয়ে মঞ্জরী আর শ্রীমতী-প্রেমদাসের মেয়ে গোপিনীর হৃদয়বৃত্তিক টানাপোড়েনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এদের জীবন চিত্রিত করতে গিয়ে তারাশঙ্কর প্রাসঙ্গিকভাবেই বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি, জীবনাচরণ প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন। বিয়ের ক্ষেত্রে জাত বিচার প্রসঙ্গও এসেছে। বৈষ্ণব এবং বাউল ধর্মে বিভিন্ন শ্রেণী বা ধর্মের মানুষ আশ্রয় নিয়ে এই ধর্ম বা শ্রেণীর রীতি-নীতি পালন করে তাদের অন্তভুর্ক্ত হয়ে যেতে

পারে। এদেরকে ভেকধারী বলা হয়। কিন্তু পুরুষানুক্রমে যারা বৈষ্ণব তারা এই ভেকধারী বৈষ্ণবদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে চায়না।

> সৌরভী বৈষ্ণবী আসিয়া কহিল, মোহান্ত, তা আমার মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দাও না কেন? ছেলেবেলায় সাথী দুটি, ভাবও খুব –
> রামদাস কহিল রাধে রাধে, তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হলাম জাত বোষ্টম, আর তোমরা ভেকধারী।
> সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, ভেক লইয়া বৈষ্ণবী হইয়াছে। তাহার মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর বিবাহ দিতে রামদাসের রুচি হইল না। [৪]

বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির একটা চিহ্ন যার নাম রসকলি। বৈষ্ণবীরা নাকে আঁকে, তারাশঙ্কর গল্পের নামের মধ্যে তা তুলে ধরেছেন।

পুলিন আর মঞ্জরী একে অপরকে ভালোবাসে কিন্তু তাদের বিয়ে হয় না। রামদাসের সৎ মেয়ে গোপিনীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় পুলিন। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলেও মঞ্জরীকে পুলিন ভুলতে পারে না। রাতদিন মঞ্জরীর দাওয়ায় পড়ে থাকে পুলিন। মঞ্জরী ব্যাপারটা উপভোগ করে, লোক-নিন্দার ভয় তার ছিল না। তারপরেও মাঝে মাঝে সে পুলিনকে বলে গোপিনীর কাছে যেতে। গানের সুরে সে পুলিনকে বলে :

> পাঁচ সিকের বোষ্টুমি তোমার,
> ওহে গোসা করেছে, গোসা করেছে। [৫]

গান বৈষ্ণবদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গল্পের আরও কিছু জায়গায় গানের ব্যবহার আছে। মঞ্জরীকে রামদাস বেশ্যা বললে পুলিন ক্ষমা চায় মঞ্জরীর কাছে। তখন মঞ্জরীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় গান:

> লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী
> সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী। [৬]

বৈষ্ণব-সংস্কৃতিকে এভাবেই তারাশঙ্কর প্রাসঙ্গিক ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। পুলিন-মঞ্জরী-গোপিনীর কথামালার আচ্ছাদনে বৈষ্ণবজীবনের একটি সুস্পষ্ট ছবি পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। গল্পের পরিণতিতে মঞ্জরী পুলিনকে গোপিনীর কাছে সঁপে দিয়ে বৃন্দাবন চলে গেল। বৈষ্ণবী মঞ্জরীকে

তারাশঙ্কর চিত্রিত করেছেন এভাবেÍ "নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কী হিল্লোল, রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।" [৭]

গোপিনীর সুখের জন্য মঞ্জরী দূরে চলে গেল, জমিদারের কাছারিতে যখন পুলিন আর মঞ্জরীর বিচার বসেছিল তখনও মঞ্জরীকে গ্রাম থেকে চলে যেতে বলা হয়। সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি লেখক সমকালে তাঁর নিজ গ্রাম লাভপুরে এই জমিদার শ্রেণীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সে সময়ে জমিদারতন্ত্রের পতনের কাল, কারণ ধনতন্ত্রের আগমন এবং প্রভাব-বিস্তার বেশ জোরেশোরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ তখনও পুরোপুরি ধনতান্ত্রিকদের হাতে চলে যায়নি, গ্রাম্য সমাজকাঠামোতে তখনও জমিদারের প্রভুত্ব মেনে নিতে হত। গ্রাম্য লোকজসমাজে মাতব্বরদের উপস্থিতিতে জমিদারের কাছারিতে বিচার সভা বসানো সমাজ জীবনেরই একটা রীতি, তারাশঙ্কর চমৎকার ভাবে তা উপস্থাপন করেছেন এই 'রসকলি' গল্পে।

হারানো সুর

(কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩৫)

রাঢ় বঙ্গের সংস্কৃতিতে বিশেষ করে হিন্দু সংস্কৃতিতে বৈষ্ণব-বাউলদের গভীর প্রভাব রয়েছে। তারাশঙ্কর এই বিষয়টি বিভিন্ন গল্পে বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। 'হারানো সুর' গল্পে বৈষ্ণবীয় চালচিত্র 'প্রসাদমালা', 'রাইকমলে'র চেয়ে ভিন্নভাবে আছে। বোষ্টমদের গার্হস্থ্য জীবন ননী-গিরির সংসার জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে। গিরি সাধারণ মেয়ে। সে চেয়েছে শিল্পপাগল স্বামীকে বাস্তব জীবনের গুরুত্ব বোঝাতে। ফলাফল স্বরূপ ননীর সব বাঁশি দিয়ে সে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করে। ননী হৃদয়ে পাথর বেঁধে এই শোক সহ্য করে সত্যি সত্যি বাস্তববাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু গিরির এটাও ভালো লাগে না, অর্থ দিয়ে তো হৃদয় ভরে না। গিরি চায় ননী অর্থকরী কাজও করবে আবার বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে তার হৃদয়কে তৃপ্ত করবে। কিন্তু ননী সুর হারিয়ে এতটাই শক্ত হয়ে গিয়েছে যে অনেক বলেও গিরি তাকে গান গাওয়াতে পারেনি।

গিরি এই জীবনের ভার সহ্য করতে পারেনা। তাই তার মা মাসিরা যখন বৃন্দাবনধামে তীর্থ করতে যেতে চাইল তখন গিরিও তীর্থে যেতে চেয়েছিল। ননী-গিরির সংসারে বোষ্টম ধর্মাচরণের চিহ্ন নেই কিন্তু এই সময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল সে তারা বোষ্টম। বোষ্টমরা গৃহে সবসময় থাকে না, তারা ধর্মকর্ম করার জন্য তীর্থে যায়। তীর্থস্থানে গিয়ে গার্হস্থ্য জীবন বা সামাজিক জীবনের অবসাদ ভুলে থাকতে

চায়। সাংসারিক জটিলতা ভুলে ভাবের দুনিয়ায় মনোনিবেশ করে শুধুমাত্র বৈষ্ণবীয় সাধনার সাগরে ডুবে থাকে। গিরিও সাংসারিক জীবনে সুখ খুঁজে পাচ্ছিল না বলে তীর্থে যেতে চেয়েছিল।

বৈষ্ণবদের প্রধান সঙ্গী হচ্ছে বাঁশী। ননী সেই বাঁশী ছেড়ে দিয়েছে গিরির জন্য। তবুও গিরির মন গলে না। এই দুঃখে সে মনকে শান্ত করার জন্য দাওয়ার উপর কড়ির ফেলে যাওয়া বাঁশি বাজায়, গিরি মুগ্ধ হয়ে যায়। সে তার সিদ্ধান্ত বদলায়, ননীকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না জানিয়ে দেয়।

গল্পে কৃষ্ণযাত্রা, কীর্তন গান গিরির মনের ভাবের প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। কৃষ্ণযাত্রা রাঢ় বাংলার লোকজীবনে বিনোদনের একটি মাধ্যম। তারাশঙ্কর তাঁর 'মঞ্জুরী অপেরা' (১৯৬৪) ও 'অভিনেত্রী' উপন্যাসে যাত্রা শিল্পকে বিস্তারিতভাবে আর ছোটগল্পের ধারণক্ষমতায় এই গল্পে কৃষ্ণযাত্রা সীমিত পরিসরে শিল্পসার্থকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সাধারণত মাঘী পূর্ণিমায় গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে উৎসব-অনুষ্ঠানে হরিনাম-সংকীর্তন, যাত্রাগান, কৃষ্ণযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

> উৎসব মণ্ডপ হইতে দূরে একটা বৃক্ষ তলে আত্মগোপন করিয়া গিরি গিয়া বসিল। তখন সংকীর্তনে গাইতেছিল –
>
> হরি-নামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে !
>
> গিরির সকল অন্তর ওই সুরেই ধ্বনিয়া উঠিল, সকল প্রাণমন জুড়াইয়া গেল; আর কি আনন্দ !----------
>
> সন্ধ্যার পর যাত্রাগান আরম্ভ হইল, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অভিনয়। ------
>
> কিশোরী প্রেমিকা তখন গাইতেছিলÍ
>
> রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর
>
> প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
>
> গিরির উন্মুখ অন্তর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ওই সুরের প্রতিধ্বনি তুলিল। তাহার বিহ্বল আবিষ্ট তন্ময় মুখ হইতে কখন বসনাঞ্চল শ্লথ হইয়া অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার হুশ ছিল না, দীপ্ত চোখেমুখে অন্তরের ঝঙ্কার যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।
>
> প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
>
> তাহার এই দীপ্ত তন্ময় ছবি কাহারও চোখে পড়িয়াছিল কি না, কে জানে, তবে ওই তরুণ কিশোরটি যেন তাহারই পানে ফিরিয়া অভিনয় করিতেছিল। সে যখন সুললিত কণ্ঠে গান গাহিয়া কিশোরীর নিকট প্রেম নিবেদন করিতেছিল তখন গিরির মনে হইল ওই নৈবেদ্য তাহার চরণে আসিয়া পৌঁছিলÍ

ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।

গিরির অন্তরের অরূপ কামনা অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে রাত্রে বাড়ি ফিরিল পুষ্পিত উদ্যানের মত মাতাল মন লইয়া। [৮]

এইভাবে ননী ও গিরির দাম্পত্য খুনসুটি, মান-অভিমান এবং সুখ-দাম্পত্য-সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের একটি বাস্তব-উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের শিল্পবোধের এবং পাশাপাশি রাঢ় বাংলার বৈষ্ণবের তীর্থ-যাত্রার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন লেখক। সাধারণ ঘটনাংশ দিয়ে, সাধারণ নর-নারীর মাধ্যমে এবং তাদের অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাপনের ফাঁকে ফাঁকে অসাধারণ শিল্পদক্ষতার সঙ্গে লোকজীবনের প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিকভাবেই নিয়ে এসেছেন তারাশঙ্কর।

চোখের ভুল

(উপাসনা, ভাদ্র ১৩৩৫)

রাঢ় বাংলার লোকজীবনের প্রতি তারাশঙ্করের আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল গভীর। বৈরাগী বোষ্টম-কীর্তনীয়া জাতীয় চরিত্র তাঁর অধিকাংশ গল্পে রয়েছে। কখনও তাদের পুরো জীবনাচরণই উঠে এসেছে তাঁর গল্পে, আবার কখনও শুধু ভাবপরিমণ্ডলেই তাদের ব্যাপ্তি। 'চোখের ভুল' গল্পে সাধারণ পল্লী জীবনের এক বালবিধবার কথা আছে আর আছে এক তরুণ সন্ন্যাসীর কথা। এই তরুণ সন্ন্যাসী বালবিধবা উমার মধ্যে তাঁর মৃত মায়ের ছবি খুঁজে পায় কিন্তু এটা বোঝা যায় গল্পের একদম শেষে গিয়ে। তার আগে গ্রাম্য মোড়ল, গ্রামের নারীরা নানারকম গুজব ছড়ায় সন্ন্যাসী আর উমাকে নিয়ে, কিন্তু উমার কঠোর ব্যক্তিত্বের কাছে কোনো গুজবই টিকতে পারে না।

লোকসংস্কৃতির অন্যতম অংশ গান ব্যবহার করা হয়েছে এই গল্পের বিভিন্ন জায়গায়। কীর্তন, ভাসানের গান, বৈষ্ণব পদাবলী ইত্যাদি লোকমুখে গীত হয়, এগুলোই লোকগান হিসেবে পরিচিত। দক্ষিণা নেওয়ার জন্য অথবা ভিক্ষা, উৎসব-পার্বণে আনন্দ-অনুভূতির জন্য লোকগান গাওয়া হয়। গল্পে কীর্তনীয়া গোকুল দাসের গানগুলো :

১. পীরিতি অসের সায়ের দেখিয়ে
   নাইতে নামিনু তায় [৯]
২. তোমারই চরণে আমারই পেরাণে
   লাগিল প্রেমের ফাঁসি– [১০]
৩. আর ত তোমায় ছাড়ব না হে

৪. কেমন করে ছাড়াও দেখি [১১]

৫. হেলিয়া দুলিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
মরাল গমনে চ-লে-এ
হায় গো রূপের লহর তুলে,
পরাণ আ-মা-র কেড়ে নিয়ে- ও সুবল রে। [১২]

৬. ও আঙা চরণতরে বিকাইতে এসেছি হে – [১৩]

এই গল্পে খুব অল্প সময়ের জন্য এক বাউলের উপস্থিতি আছে। বাউল সম্প্রদায় রাঢ় বাংলার লোকজীবনের ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়, আর বাউল গান এই বাউল সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন। বাউল গানের মাধ্যমে বাউলরা গৃহস্থের মনোরঞ্জন করে এবং গান শেষে বিনীতভাবে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। গানের সময় বাউল কখনও একতারা বাজিয়ে গান করে। ঈষৎ হেলে দুলে, কখনও বা পায়ে নূপুর বেঁধে গানের সঙ্গে তারা নাচে। বাউল নাচের একটি প্রত্যক্ষ চিত্র ফুটে উঠেছে তারাশঙ্করেরই আরেকটি গল্প 'বাউল'-এ। 'চোখের ভুল' গল্পে বাউলের কণ্ঠে গান আছে একটি, তিনবারে এই অংশটুকু ভাগ করে গেয়েছে বাউল :

দশাননের অশোক - কানন দহনভরা গহন হে,
সহন করে তুচ্ছ লাগে তোমার চিতের দহন হে !
কাজ কি আমার পরের কথায়, মানি শুধু তোমায় হে,
তোমার কথায় সব আগুনের দহন হবে সহন হে।
আমি জানি আমার মন, তাই তো তোমার চরণে হে
সবার মাঝে এলাম রাম পরান করে বহন হে। [১৪]
"রাম পদাবলী এটি। সীতার পরিভক্তির গান" [১৫]

তরুণ সন্ন্যাসীর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে গান–

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায় গো ! [১৬]

গ্রামের অভিভাবকহীন বালবিধবাদের সামাজিক জীবনের একটা প্রতিচ্ছবি এই গল্পে পাওয়া যায়। গ্রামের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় অনেক দুর্বল থাকে, পুরুষের অধীনে নারীকে পদানত করে রাখা হয় সবসময়। এরকম সামাজিক পরিমণ্ডলে কোন নারী বিধবা হয়ে গেলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে নিয়েই আরো বেশি কটাক্ষ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। এ রকম

অবস্থায় কোন নারী যদি ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে সেই কটাক্ষকে উপেক্ষা করে চলতে চায় তাহলে সমাজে আরো পরচর্চা শুরু হয়ে যায়। সমাজের এই প্রেক্ষাপট তারাশঙ্কর উপস্থাপন করেছেন এই গল্পে।

রাইকমল

(কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)

রাঢ় বাংলার গ্রামীণ সমাজজীবনে বোষ্টমদের হৃদয়ের মুক্ত প্রেম নিয়ে লিখেছেন তারাশঙ্কর তাঁর 'রাইকমল' গল্পে। এই নামে তাঁর একটি উপন্যাসও আছে। গ্রামের মধ্যে কমলিনীর মা কামিনীর আখড়া। রসিক বাউলের আখড়া তার কাছেই। গ্রামের হরি মোড়লের ছেলে রঞ্জন কমলের খেলাঘরের সঙ্গী। কামিনীরা জাত বোষ্টম। খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে। আর রঞ্জন কমলের জন্য ভেক ধরে বোষ্টম হতে চায়। কিন্তু রঞ্জনের বাবা কামিনীকে টাকা দিয়ে তার মেয়ে কমলকে রঞ্জনের জীবন থেকে সরে যেতে বলে। কামিনী তার মেয়েকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে নবদ্বীপ চলে যায়। বৈষ্ণবদের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গিয়ে আখড়া বা আবাস গড়ার প্রসঙ্গ এই গল্পে রয়েছে। উদার এই বৈষ্ণব ধর্মে সবারই স্থান হয়, তাই এক অঞ্চলের বৈষ্ণবরা অন্য অঞ্চলে গিয়ে সহজেই স্থিত হতে পারে। বৈরাগী রসিক তাদের সঙ্গী হল। সেখানে কামিনী মৃত্যুর সময় মেয়েকে রঞ্জনের থেকে দূরে থাকতে বলে এবং অন্য কাউকে বিয়ে করতে বলে যায়। কমল নিতান্ত বিয়ে করতে হবে বলে করাÍ এরকম মনোভাব নিয়ে রসিককে বিয়ে করে। এখানে বৈষ্ণবদের বিয়ের প্রথা মালাবদল উপস্থাপন করেছেন তারাশঙ্কর। আনুষ্ঠানিক বিবাহ-রীতি বৈষ্ণব ধর্মে ততটা অনুসরণ করা হয় না, মুক্ত বিবাহ প্রথা বেশি প্রচলিত।

কিন্তু মনহীন দেহ কমল কাউকে দিতে চায় না। রসিক বুঝতে পারল কমল মন থেকে রঞ্জনকে মুছতে চায়না। সংসারের বন্ধনে মনের কামনা জেগে ওঠে, রসিক আর কমল তাই ঘর ছেড়ে আবার পথে বের হয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের জন্মভূমিতে এসে আবার তাদের নিজেদের আখড়ায় স্থিত হবার ইচ্ছা জাগল এবং তাই করল। কিন্তু কমল যুবক রঞ্জনের উগ্র ক্ষুধার্ত দৃষ্টির সঙ্গে কিশোর রঞ্জনকে মেলাতে পারল না। কৈশোরে যে রঞ্জনকে সে ভালোবেসেছিল সেই রঞ্জনকে না পেয়ে কমলের মন দ্বিতীয়বার ভাঙ্গল। রঞ্জন কমলের মুখ দেখলে পাপ হয় বললেও বেনে পুকুরের ঘাটে সিক্ত কমলকে দেখে তার দেহ মন আবার ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু কমল সেই কামনাকে গুরত্ব দেয়নি। রসিক রঞ্জনের আখড়ায় আসাটা ভালোভাবে নিতে পারেনি, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে সে।

আর রসিকের মৃত্যুর পর কমল তাকে গুরুর সম্মান দিয়ে তার আখড়ার জোড়ালতার কুঞ্জতলে তাকে সমাধি দিল।

লোকগান এই গল্পেরও অনেক অংশ জুড়ে আছে। সেসময়ে গায়কেরা নিজের রচিত গানের পাশাপাশি বৈষ্ণব পদাবলী রাধা-কৃষ্ণ সম্পৃক্ত গানগুলো গাইত, লোকমুখে এসব গান প্রচলিত ছিল। মূল পদাবলী অনুসরণ করা হলেও কালক্রমে গানের কথায় কোথাও কোথাও অদল বদল হয়ে যেত। লোকসমাজে শিল্পের শুদ্ধতা ততটা গুরুত্ব পায় না, মনোরঞ্জন প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই গল্পের গানগুলো হল :

বহুদিন পরে বঁধূয়া এলে–
দেখা তো হত না পরাণ গেলে – [১৭]

সখি বলিতে বিদরে হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমারই আঙিনা দিয়া ॥ [১৮]

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাইÍ
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার-ই ঠাঁই ॥ [১৯]

বড় ভালবাসি আমি– কলঙ্কিনী নাম গো।
কলঙ্কের তরে আমি হারাই কি শ্যাম গো ॥
শ্যামের আগে রাধার দিয়ে ডাকে রাধাশ্যাম গো। [২০]

কমলিনী বৈষ্ণবীর নিষ্পাপ প্রেমানুভূতির মধ্যে দিয়ে তার মনের শুদ্ধতা তুলে ধরেছেন লেখক। সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রচলিত ধারণা ছিল যে বৈষ্ণবদের মনের কোন শুচিতা থাকে নাÍ এই ধারণাকে কমলিনী মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। কমলিনী রঞ্জনকে ভালবেসেছিল কিন্তু সে ভালবাসায় কোন কাম ছিল না। তাই রঞ্জনের চোখে যখন সে কামনার উগ্র ছায়া দেখেছে তখন থেকেই রঞ্জনের কাছ থেকে দুরে থাকতে চেয়েছে।

মরুর মায়া

(উপাসনা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৩৭)

যাযাবর হাঘরে শ্রেনীর জীবনের রূপ, প্রকৃতি এই 'মরুর মায়া' গল্পটিতে তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছেন চমৎকারভাবে। এই যাযাবর শ্রেণী লেখকের পরিচিত, 'আমার কালের কথা'য় তিনি তাদের প্রসঙ্গে বলেছেনÍ "আর এক দল দেশী যাযাবর আমাদের দেশে আছে। আমাদের অঞ্চলে বাজীকর বলে। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়। পুরুষেরাও ঢোলক বাজিয়ে গান গায়। সমসাময়িক ঘটনা নিয়েই এরা গান বাঁধে।" [২১] এই গল্পে যাযাবর শ্রেণী উঠে এসেছে নিম্নোক্তভাবে :

> "হাঘরে, চির পথিকের দল সব, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত গৃহহীনের দল চলিয়াছে, শুধু চলিয়াছেইÍ।
>
> বিশ্রামের তরেই প্রান্তরের বুকে তাঁবু পড়ে।
>
> ঘোড়াগুলা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়, কুকুর গুলাও ঘুমায়, জীবগুলারও বুঝি ক্লান্তি আসে। বিশ্রাম নাই শুধু ওই প্রান্তরের যাত্রীদলের।
>
> সংগ্রহ সঞ্চয়; ওরা সব দলে দলে গ্রামের পানে ছুটে; কেহ সন্ন্যাসী সাজে, মাথায় নামাবলী, কপালে তিল, পরনে গেরুয়া, হাতে কমণ্ডলু, কাঁধে ঝুলি, মুখে আশীর্বাদের বুলিÍ 'সী-ত্তা-রাম, সী-ত্তা রাম, সাধু সে-বা-করে। -রাম-বাড়ির মঙ্গল হোবে রাম ধন দৌলত দিবেন রাম।
>
> কেহ কেহ যায় বাঁশবাজি, দড়ি বাজি করিতে, কসরত দেখাইতে, কপালের উপর লম্বা বাঁশ খাড়া করিয়া দেয়, তার উপরে শুইয়া থাকে হা ঘরের ছেলে, সে আবার সেথায় হাততালি দেয়।
>
> ----------
>
> কেহ ভোজবাজি দেখায়; বস্তায় ছেলে পুরিয়া ধারাল ছুরি দিয়া খুঁচিয়া খুঁচিয়া মারেÍ আবার তাহাকে বাঁচায়।
>
> নারী ফেড়ে মাদুলি, বাতের তেল, ধনেস পাখীর হাড় ও ঝুমঝুমি বিক্রয় করিয়াÍ 'আয় গো বহুড়ী, আয় গো বিটীয়া, লে-লে-গে- মাদুরী - লে গে। [২২]

এই হাঘরে শ্রেণীর ছেলে ননকু, ডগরু আর সানিয়ার চুরি করা ছেলে। ডগরু নিজেও চুরি হয়ে এই সমাজে এসে পড়েছিল। ননকু নিজের মা, নিজের গ্রামের প্রতি টান অনুভব করে। অসুস্থ ডগরু যখন ননকুর আসল বাবার ঠিকানা দিল, তখন ননকু প্রবল ক্রোধে ডগরুকেই মেরে ফেলতে চায় কেন তাকে চুরি করে এনেছিল মায়ের কোল থেকে। ক্রোধের উন্মত্ততায় সে স্ত্রী কাজরী, ডগরু, সানিয়াকে

ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু যখন তার ক্রোধ শান্ত হয় তখন তার বোধোদয় হয় যে বহু বছর আগের হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে কেউ গ্রহণ করবে না। তখন সে আবার হাঘরে জীবনে তার স্ত্রী, বাবা, মার কাছে ফিরে আসে। গল্পের শেষে ননকু ফিরে এসে কাজরীর জীবনকে পূর্ণ করে দিয়েছে। প্রথমে সে ভাবেনি যে কাজরীর কাছে আবার ফিরে আসবে, ফিরে না আসার জন্যই ননকু চলে গিয়েছিল। কিন্তু পরে তার সামাজিক বিধি-নিষেধের কথা মনে হয়। সেই বিধি-নিষেধ এরকম যে অবস্থাপন্ন বা সাধারণ সমাজের মানুষ যাযাবর শ্রেণীকে অন্ত্যজ শ্রেণী হিসেবে গণ্য করে। নিজের হারানো ছেলে হলেও অন্ত্যজ শ্রেণীর কাউকে সমাজ গ্রহণ করে না। গল্পের মধ্যে তারাশঙ্কর কাহিনীর বিস্তারের চেয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের স্বরূপ তুলে ধরার দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। হাঘরে শ্রেণীর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তাদের জীবনের ছবি এঁকেছেন লেখক এই গল্পে।

ননকু তার আসল মায়ের সন্ধানে যখন বের হয় তখন কাজরী ভাবে তার বহুদিনের সাজানো স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। ননকুকে ছাড়া সে এক মুহূর্ত কল্পনা করতে পারে না। সে ননকুর জন্য অপেক্ষা করতে চায়। কিন্তু ডগরু তাদের দলের মধ্যে প্রচার করে দেয় যে ননকু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। দলের একজন ধরা পড়লে বাকিরাও বিপদগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তখন সবাইকেই জায়গা বদল করতে হয়। এই গল্পে রয়েছে :

> ডগরু কহিলÍ " মালুম হোতা রাতকে কাহাঁ পাকড়া গয়া।"
> ডগরু মিথ্যা কহিল; রাত্রে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে কহিল। নতুবা হয়ত' এই প্রান্তর যাত্রীর দল প্রান্তর বুকের ঝড়ের মত তার সন্ধানে বাহির হইয়া ননকুর টুঁটি ছিঁড়িয়া আনিত।
> কাজরী ইহার প্রতিবাদ করিল না, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। কেহ চুরি করিতে ধরা পড়িলে সারাটা দলশুদ্ধ বিপদাপন্ন হয়Í সেজন্য বাকী সকলে বস্তি উঠাইয়া চলিয়া যায়, যে গেল সে গেল, পিছনের তরে কাঁদিতে প্রান্তরের যাত্রীর দল পড়িয়া থাকে না। [২৩]

এভাবেই হাঘরে শ্রেণীর ভাসমান জীবনের বাস্তবতা তারাশঙ্কর গল্পের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসাদমালা

(নবশক্তি, ফাল্গুন ১৩৩৭)

'প্রসাদমালা' গল্পে প্রেমসুন্দর বাবাজী চরিত্রকে কেন্দ্র করে উন্মোচিত হয়েছে বৈষ্ণব জীবন ও সমাজের কথকতা। গোপালের মা আর ললিতার মা ছোটবেলায় ললিতা আর গোপালের বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গোপালের বাবার অপকর্মের ফলে পারবারিক কলহ শুরু হয়। কিশোর বয়সে গোপাল সেই কলহের কারণটা ধরতে পারেনি। হঠাৎ করে সম্পর্কের মাধুর্য কেন নষ্ট হয়ে গেলÍ গোপাল সেটা বুঝে উঠতে পারে না। সংসারের এই অদ্ভুত জটিলতা এড়াতে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। গোপালের মা ললিতার মাকে এই জন্য দায়ী করেছে। কিন্তু গোপাল স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য গ্রামে প্রেমসুন্দর নামে এক বৈষ্ণব বাবাজির কাছে গিয়েছিল। গল্পে উল্লেখ আছে:

> ললিতার মার কথাই সত্য হইল, গোপালকে পাওয়া গেল, সে প্রায় মাস দেড়েক পর। সাত আট ক্রোশ দক্ষিণে চন্দনকাঠি গ্রামের নাম করা কীর্তনীয়া। প্রেমসুন্দর বাবাজীর কীর্তনের দলে ভর্তি হইয়া সে গান গাহিয়া ফিরিতেছিল। বাবাজীকে বলিয়াছিল– সে অনাথ। বাবাজী দয়া করিয়া তাহাকে বাড়িতেই রাখিয়াছিল, গান শিখাইত; আসরে গানের সময় বাবাজীর আদেশমত দুএকখানা তালিম দেওয়া গান সে একাই গাহিত। ২৪

ললিতা গোপালের বালিকাবধূ। গোপালের মা কাত্যায়নী আর ললিতার মা চিত্তকালী দুজনে সই। গোপাল ছেলেবেলায় ললিতাকে বৌ সাজিয়ে খেলাঘর পাতাতো। তাই দুই সখি তাদের ছেলেমেয়ের বাল্যবিবাহ দেয়। নয় দশ বছরের গোপালের সঙ্গে পাঁচ বছরের ললিতার বিয়ে দিয়েছিল দুই সই। কিন্তু সেই খেলা ঘরের পাতানো সংসার আর থাকে না। গোপালের বাবা হরি মোড়ল গোপালের শাশুড়ির প্রতি কুদৃষ্টি দেয়। কাত্যায়নী ব্যাপার বুঝতে পেরেও নিজের স্বামীর দোষ না ধরে চিত্তকালীকেই কটু কথা শুনিয়ে আসে এবং বাল্যবিয়ের কথা ভুলে গিয়ে গোপালের আবার বিয়ে দিতে চায়। হরি মোড়লও সুযোগ মতো চিত্তকালীর ভিটা-বাড়ি, জায়গা জমি সব দখল করে নেয়। গোপাল তার মা আর শাশুড়ির এসব ঝগড়া দেখে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যায়। ললিতাকে নিয়ে চিত্তকালী বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। গোপাল পালিয়ে প্রেমসুন্দর বাবাজীর কাছে গিয়েছিল, থেকেছিল মাস দেড়েক। গোপাল ফিরে এসে ললিতাদের বাড়ি গিয়ে দেখে কেউ নেই :

> গোপাল কিছু বুঝিতে পারিল না। সে এ–ঘর ও–ঘর খুঁজিয়া ফিরিল, কেহ কোথাও নাই; মানুষের বসবাসের কোন চিহ্ন নাই; শুধু বড় ঘরে দাওয়ায় একটা বিপর্যস্ত খেলাঘর, ভাঙা খোলা, বালির ভাত, শুকনো ঘাসের তরকারি, একপাশে ইট দিয়া ঘেরা খেলার শয়ন ঘরে কাপড়ের টুকরা দিয়া সাজানো দুইটি পুতুলÍ গোপালের মেয়ে, ললিতার ছেলে। [২৫]

গোপালের মন ভেঙে গেল। সে কার্তিক মাস পড়তেই কীর্তনের দলের সঙ্গে চলে গেল।

> সংসারে প্রথম প্রবেশমুখে প্রেমসুন্দর বাবাজী স্ত্রী, দুটি সন্তান সব একদিনের কলেরায় হারাইয়াছিল। আজ এই সর্ববন্ধনশূন্য প্রিয়দর্শন কিশোরটিকে কাছে পাইয়া বৈরাগীর ক্ষুধাতুর অন্তর যেন কৃতার্থ হইয়া গেল ; আজীবন সঞ্চিত স্নেহধারা নিঃশেষে ঢালিয়া দিল। সে গোপালকে সন্তানের মত স্নেহ করে, শিষ্যের মত শিক্ষা দেয়, এক সঙ্গে খায়, কাছে লইয়া শোয়, মায়ের মত মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, বাতাস করে। সরল পল্লীবাসী বৃদ্ধ অন্তরের প্রেমভক্তি ঢালিয়া ব্রজের কথা, ব্রজের গাথা, ব্রজের কাহিনী বলে, সে গাথা গোপালের বুক চিরিয়া বসে, বলিতে বলিতে বক্তাও কাঁদে, শ্রোতাও কাঁদেÍ সেই ভাবাবেশের মধ্যে বাবাজী গোপালকে গান শিক্ষা দেয়; ভাবরুদ্ধ কিশোর কণ্ঠে গান কাঁদিয়া ফেরেÍ এ মাহ ভাদর - এ ভরা বাদর, শূন্য মন্দির মোর। " [২৬]

গোপাল এভাবেই বৈষ্ণব জীবনের সঙ্গে, বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে গোপালের মা ছেলের দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু সাত দিনের প্রবল জ্বরে কাত্যায়নী মৃত্যু বরণ করে। তার আট মাস পরে গোপালের বাবা হরি মোড়লও মারা যায়। গোপাল বাবা-মাকে হারিয়ে প্রেমসুন্দর বাবাজীর কাছে থাকা শুরু করে। তার বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে সে কাউকে না বলে ললিতার খোঁজ করতে ললিতার মামার বাড়ি যায়, সেখানে এবং সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজে না পেয়ে আবার বাবাজীর সদা প্রসারিত উদার স্নেহময় বুকে ফিরে আসে কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্য সম্মতি দেয় না।

তার চার বছর পর বাবাজীও মৃত্যুবরণ করে। এই ঘটনার পর ললিতার মা সন্ধান করে গোপালকে চিঠি পাঠায়। চিঠিতে লিখে পাঠায় ললিতার ভার গ্রহণ করতে কারণ সে নিজে মৃত্যুপথযাত্রী। কলকাতায় ভবানীপুরে দাসীবৃত্তি করে এতদিন তারা সংসার চালিয়েছে। চিত্তকালীর মৃত্যুর পর ললিতাকে নিয়ে বৈরাগীর আখড়ায় গোপাল সংসার বাঁধল। গ্রামের মানুষ ললিতাকে নিয়ে কুকথা বলতে পারে তাই গ্রাম ছেড়ে এখানে সে সংসার বেঁধেছে। কিন্তু ললিতা কলকাতায় থেকে শহুরে

জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, গোপালের সঙ্গে মানিয়ে চলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। গোপালেরও একই অবস্থা। দুজনের জীবনযাত্রার ঢং ভিন্ন, কিছুতেই এক বিন্দুতে মিলতে পারছিল না দুজন। গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত গোপাল শহুরে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ললিতার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছিল না। একদিন ভোলা নামক ব্যক্তির সঙ্গে জড়িয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাতে ললিতা গোপালের সংসার ছেড়ে চলে গেল। উপাসনা ঘরের ঠাকুরের আসনে প্রসাধনের সামগ্রী রেখে সাজগোজ করাতে গোপালের রাগ উঠে গিয়েছিল। ললিতা যাওয়ার সময় অলঙ্কার, গোপালের সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে গিয়েছিল।

ললিতা ভোলার কাছে যাবে বললেও তার কাছে যায়নি। গোপাল ভোলার কাছে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারে যে ভোলা বিয়ে করে সংসারী হয়েছে, আর ললিতা তার কাছে যায়নি। গল্পের শেষে বিরহী গোপাল ললিতাকে খুঁজে পায় :

> পথে একটা মঠে নারীদের সংকীর্তন হইতেছে, অনাথা পতিতাদের আশ্রম, সংকীর্তনে গাহিতেছিল মূল নায়িকাÍ
>
> > বড় দুঃখ দিয়াছি হে ধরায়েছি পায়–
> > ক্ষমা কর পায়ে রাখ দুখিনী রাধায়।
>
> গোপাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, এই সুর, এই গান চাই। সে ধীরে ধীরে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিগ্রহের সম্মুখে কীর্তন হয়, নারীদের হাতে সব একগাছি মালা, আরতির পরে বিগ্রহের চরণে উপহার দিবে। গোপাল দাস বিগ্রহ প্রণাম করিতে গিয়া স্থাণুর মত অচল হইয়া গেল যেন; কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। বিগ্রহকে সে প্রণাম করিল না, দেবমূর্তির পানে পিছন ফিরিয়া সে গিয়া গায়িকার হাত ধরিয়া বলিল 'ললিতা'। [২৭]

ললিতা দেবতার জন্য মালা গেঁথে এনেছিল, সেই মালা পরিয়ে দিল গোপালের গলায়। গোপালের বাড়ি থেকে বের হয়ে ললিতা মাসীর বাড়ি গিয়েছিল। মাসী মারা গেলে সে এভাবেই দিনযাপন করছিল। গল্পের শেষে গল্পের নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় :

> কীর্তন গাহিয়া ফিরিয়া গোপাল হাসিমুখে গৌরগলার প্রসাদী মালা ললিতার গলায় পরাইয়া দিল। ললিতা সে মালা মাথায় তুলিয়া গোপালকে প্রণাম করিয়া বলিলÍ 'ছি,

> দেবতার প্রসাদী মালা, মাথায় দাও। ' গোপাল তাহার কথায় উত্তর দিল না, সযত্নে তাহাকে তুলিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গান ধরিলÍ
>
> 'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলেÍ
> দেখা না হইত পরান গেলে।' [২৮]

গল্পের শুরুতে গোপাল আর ললিতা বৈষ্ণব বা বাউল-শ্রেণীভুক্ত ছিল না, কিন্তু ঘটনাক্রমে বৈষ্ণবীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা বৈষ্ণব সমাজেই স্থায়ী হয়ে যায়। বৈষ্ণব সমাজের প্রধান অবলম্বন গানÍ এই গান খুব সহজেই গোপাল শিখে নেয়। ললিতাও ঘটনাক্রমে অনাথা-পতিতা-পরিত্যক্তা নারীদের সংকীর্তন দলে গিয়ে যুক্ত হয় এবং সেই দলের প্রধান গায়িকা হয়ে ওঠে। এভাবেই তারা এক সমাজ থেকে অন্য একটি সমাজে স্থিত হয়।

মালাচন্দন

(উপাসনা, ফাল্গুন ১৩৩৮)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মালাচন্দন' গল্পে লোকজীবনের বিয়ের রীতি উঠে এসেছে। বিয়ে এবং বিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বোষ্টম সমাজে বিয়ের একটি মুক্ত রীতি আছে, সেটার নাম মালাচন্দন :

> এই বিবাহরীতি হিন্দু সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষত উচ্চ ও মধ্য বর্ণগুলির মধ্যে স্বীকৃত তো নয়ই, স্বৈরাচার বলেও নিন্দিত। অথচ মানব হৃদয়ের মুক্তির, স্বাধীন প্রেমের স্বাধীন চরিতার্থতার এমন একটি বাতাবরণ এর মধ্যে আছে, আমাদের মধ্যযুগলালিত পারিবারিক সামাজিক জীবনের হৃদয়-বিনাশী বিধানের বিরুদ্ধে যার বিদ্রোহ। আধুনিক শিল্পী সাহিত্যিকরা যখন হিন্দুর সামাজিক দৃঢ়বদ্ধ গঠনের মধ্যে বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার সন্ধানী তখন এই বোষ্টম বৈরাগীরা একটা বিরাট সুযোগ এনে দিল তাদের সামনে। তারাশঙ্কর 'রাইকমলে' যেমন মালাচন্দন রীতিটির পূর্ণ তাৎপর্যবহ ব্যবহার করেছেন, তেমনি ' প্রসাদমালা' গল্পে দীর্ঘ বিরহ বিচ্ছিন্ন নায়ক নায়িকার মিলন বন্ধন তৈরি করল মাল্যচন্দন। 'রসকলি' গল্পে গোপিনীকে ত্যাগ করে মঞ্জুরীকে মালাচন্দন করতে চেয়েছিল পুলিন। [২৯]

'মালাচন্দন' গল্পের নায়িকা তুলসী বিধবা। তার সদ্‌গোপ বান্ধবীর সাহচর্যে ভেবেছিল বিধবাদের নিয়মে জীবনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবে। "বছর বিশেক বয়স মেয়েটির নাম তুলসী; -'জাত-

বোষ্টোমের ঘরের মেয়ে, চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হইয়াও তাই পত্যন্তর গ্রহণ করে নাই। 'জাত-বোষ্টোম' পুরুষানুক্রমিক বৈষ্ণব, গৃহস্থের মত ঘর বাঁধিয়া সৎজাতি গৃহস্থের আচার ব্যবহার মানিয়া চলে। ..... বাউল ভেকধারী বৈষ্ণবীরা 'ছিঁড়লে মালা, নতুন গাঁথে'। অর্থাৎ বৈষ্ণব থাকিতেই মনান্তরে বা এমনি কারণে বৈষ্ণবী নতুন বৈষ্ণবীর গলায় মালা, ললাটে চন্দন পরাইয়া মালাচন্দন করে। কিন্তু এরাÍ এই জাত বোষ্টোমেরা সৎজাতি গৃহস্থের অনুকরণে বৈষ্ণব থাকিতে মালাচন্দন করা ত দূরের কথা, বিধবা হইয়াও নতুন আশ্রয় গ্রহণ করে না; এ শুধু লজ্জায় নয়, বহুদিন হইতে পালন করিয়া এ আচার তাহাদের সংস্কার; ধর্ম বিধান সত্ত্বেও সংস্কার তাহারা লঙ্ঘন করিতে পারেনা।" [৩০]

তুলসীর মা তুলসীর বিয়ে দেয় দশ বছর বয়সে। ছেলেটির বয়স তখন বারো। শ্যামল কোমল কিশোর ছেলেটি ষোল বছর বয়সে মারা যায়। তুলসীর মা আবার তুলসীকে বিয়ে দিতে চায়:

> তুলসী বিস্ফারিত নেত্রে মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল– কথা কহিল না। মা বুঝিতে পারিল না বিস্ময়, কি ভর্ৎসনা; সে কহিলÍ 'এমন করে তাকিয়ে থাকিস্ না তুলসী, এ আমাদের আছে,Í আমরা বোষ্টেমÍ আমরা ছিঁড়লে মালা নতুন গাঁথি; এ আমাদের ধম্মে আছে, শাস্ত্রে আছে, – শুধু কথার কথা নয়; তবে আমরা সে করি নাÍ গেরস্ত সমাজে নিন্দে হবে বলে। তা না হয় আমরা ভেকধারী সমাজেই থাকব। [৩১]

কিন্তু তুলসী দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চাইল না। তুলসীর মা অনেক বুঝানোর পরেও তুলসী তার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। গ্রাম্য সমাজে কমবয়সী বিধবাদের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা কষ্টের । কিন্তু তুলসীর স্বভাবসুলভ সংযম এবং শালীন আচরণ সবরকম বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করেছে।

> তুলসী শান্তভাবে আসিয়া নত হইয়া যুবকটিকে নমস্কার জানাইয়া কহিল,Í'অনুমতি করুন, আমাদের বেলা যায় প্রভু'।
> তাহার স্বভাবসিদ্ধ শীলতায় এমনি একটি সংযত মহিমা লইয়া সে দাঁড়াইল, সে উচ্ছৃঙ্খল যুবক কয়টিও একটু সংযত না হইয়া পারিল না; এটা বোধ করি শীলতার একটা ধর্ম,Í অপরের সম্ভ্রম একটা জাগাইয়া তুলিবেই। [৩২]

এভাবে তুলসী সমাজের সব কটাক্ষ, সব কটূক্তি, সব কটু আহবান অগ্রাহ্য করে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু জয়দেব যাওয়ার পথে পথ হারিয়ে যখন মোহনদাসের সঙ্গে তুলসীর পরিচয় হল তখন তুলসী আগের

সব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল। গ্রাম্য লোকজীবনে রীতি রেওয়াজ মেনে চলতে হয়, তা না হলে গ্রামে নানা অকথা-কুকথা রটে যায়। তুলসীর সমাজে দ্বিতীয় বিয়ের রীতি থাকলেও তুলসী এতদিন ধরে সেটা পালন করেনি। তার মনও চায়নি কিন্তু কাদুর কাছে তাঁর মনের অবস্থা সে জানায় :

> 'তোদের ত' এ রীতি আছে'।
> 'রীতি আছে, কিন্তু এতদিন ত' এ রীতি মানি নি; এ রীতির কথা নয়,
> আমার মনের কথা; আমার মন আমি বুঝতে পারছিনা ননদিনী, তুই বলে দে।' [৩৩]

মোহনদাসের সংস্পর্শে তুলসীর মনে প্রণয় সঞ্চার হল। মোহনদাস আর তুলসীর মালাচন্দন হল পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্নায়। মোহন দাস বিয়ের আগেই তুলসীকে জানিয়েছিল যে তার মৃত্যুপথযাত্রী এক স্ত্রী বর্তমান। নাম গৌর ভামিনী। ভামিনী স্বামীর এই দ্বিতীয় বিয়ে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তুলসী মোহনদাসের বিছানা ভামিনীর ঘরে করে দেয়। অথচ ওই রাত তুলসী-মোহনদাসের ফুলশয্যার রাত ছিল। ভামিনীর মৃত্যুর পর তুলসী মোহনদাসের সংসার জীবন শুরু হল। হাসি, গান-আনন্দ, অশ্রু, পুনর্মিলন, অভিনয়, অভিমান সবকিছু দিয়ে জীবন তখন পূর্ণ। কিন্তু বছর আটেক সংসার করার পর তুলসীর মনে হল সুর কেটে গেছে কোথাও। সন্তানহীন জীবন আরো নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল তুলসীর। কিন্তু মোহনদাসের এদিকে নজর নাই। তুলসীর রূপযৌবনে ভাটা পড়তেই আরেক তরুণী শ্যামাঙ্গী নারীকে বিয়ে করে নিয়ে আসে সে। তার যুক্তিÍ বৈষ্ণবদের ধর্ম রূপের সাধনা। মোহনদাসের এই স্বভাবের পরিচয় পেয়ে তুলসী আর তার সঙ্গে থাকেনি, সে আবার উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে বেরিয়ে পড়েছে।

সর্বনাশী এলোকেশী

(উপাসনা, পৌষ ১৯৩৯)

'সর্বনাশী এলোকেশী' গল্পে লেখক এক দাম্ভিক বৈষ্ণবের পশু-প্রেমের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তারাশঙ্কর তাঁর প্রিয় রাঢ় বাংলার লোকজীবন এবং রাঢ় বাংলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আচার-আচরণ-বিধি-সংস্কৃতি মাঝে মাঝেই প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই গল্পটি তারই একটি উদাহরণ। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বলরাম দাস। সে বৈষ্ণব। স্বভাবে রূঢ়, উদ্ধত। বৈষ্ণবীয় জীবনচর্যা সে সর্বাংশে পালন করে না। এ সম্পর্কে গল্পকার লিখেছেন :

> আবার দশের কাছে বলরাম পরিচয় দেয়Í 'আমরা ত্রিপুরা ভৈরব বৈষ্ণব, আমরা কারও তোয়াক্কা রাখি না।'
>
> বৈষ্ণব জাতির ইতিহাসের মধ্যে এমন কোন শাখার অস্তিত্ব আছে কিনা কে জানে, বলরাম কিন্তু ত্রিপুরা ভৈরব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন, আহার বিহার সম্পর্কে একটি বেশ ধারাবাহিক পরিচয় দিয়া শাস্ত্রবাক্যের দোহাই পাড়েÍ
>
> 'কারণ' বারিতে আগে কর আচমন।
>
> মৎসে মাংসে ভোগ পরে করিব নিবেদন। [৩৪]

গ্রাম-গ্রামান্তরে বৈষ্ণবদের মৃতদেহ সৎকার করা বলরামের কাজ। কিন্তু বৈষ্ণবীয় বিধি মানার ব্যাপারে তার প্রচন্ড রকম অনীহা। গ্রামের অন্য বর্ণের লোক বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা খুবই ক্ষুব্ধ বলরামের ওপর:

> শেষ পর্যন্ত ওর যদি মহাব্যাধি না হয়ত কি বলেছি আমি। বৈষ্ণব হয়ে মদ, মাংস, রাধে রাধে। '
>
> হরিশ গামছার গিঠঁটা ফাঁকা করিয়া সবজিগুলি দেখিতেছিল, চাটুজ্জে পোটলাটা সরাইয়া রাখিয়া ফিসফিস করিয়া কহিলেনÍ
>
> 'শালা মুরগি খায় হে। আমাকে সেদিন খানিকটা মাংস দিয়েছিল ভায়া-বললেÍ পক্ষী মাংস–ফাঁদ পেতে 'সরাল' পক্ষী ধরেছি; সরু সরু হাড়Í তা আমি ভাবলাম সরালও বন্য হংসÍ এ না হয় খেতে পারা যায়। কিন্তু ভায়া দেখি মাংস অতি সুস্বাদু, ও মুরগি না হয়ে যায় না। নিশ্চয়ই মুরগি – রাধে রাধে। [৩৫]

বলরাম সমাজের গ্রামবাসীর কথার প্রতিক্রিয়া দেখাত এভাবেÍ "আমি খাব, আমি মদ খাব– মাংস খাব, আমার যা মন চায় তাই করবÍ তাতে কোন শালার কি?" [৩৬]

গল্পের পরিণতিতে বলরাম কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা করে। গ্রামের মানুষ বলে দেবতার অভিশাপে তার এ অবস্থা হয়েছে। এলোকেশী নামের বাছুরকে আঘাত করে খোঁড়া করে দেওয়ার পর যে পশু-প্রেমের পরিচয় বলরাম দিয়েছে তা গল্পটিকে ভিন্ন মহিমা দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ডাইনীর বাঁশী

(ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪০)

অশিক্ষা-ভরা গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে কুসংস্কার। মানুষের জীবনকে তা কীভাবে প্রভাবিত করে 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পে স্বর্ণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছেন। লোকসমাজে ডাইনীকে সবাই এড়িয়ে চলতে যায়। কারণ সবাই বিশ্বাস করে ডাইনীর মত অনিষ্টকারী আর দ্বিতীয়টি নাই। ডাইনীরা ছোট বাচ্চার প্রতি, সন্তান-সম্ভবা নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়Í এগুলো সমাজের মানুষের অন্ধবিশ্বাস। জ্ঞানের অজ্ঞতা আর অন্ধবিশ্বাসের কারণে কুসংস্কারের জন্ম। যদি ডাইনীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর কারও মৃত্যু হয়, তাহলে অবধারিতভাবে ধরে নেওয়া হয় যে ডাইনীর কারণেই মৃত্যু হয়েছে। এমনকি শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে সমাজ সাধারণ একটি নারীকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে সমাজ থেকে আলাদাও করে দেয়। এই গল্পে রাধানগরের বেনেদের মেয়ে স্বর্ণ, প্রতিবেশীর পাঁচ বছরের ছেলে টুকুর সঙ্গে তার খুব ভাব। কিন্তু টুকুর মা স্বর্ণকে পছন্দ করে না, টুকুর সঙ্গে মেলামেশা করা আরো পছন্দ করে না।

> মানু ঝঙ্কার দিয়ে উঠিলÍ " যা ইচ্ছে তাই বৈ কি? ওর মা ডাইনী ছিল না?
> সৈরভী কহিলÍ " মা ছিল তা ওর সঙ্গে কি?"
> মানু কহিলÍ "ওর সঙ্গে কি? নিম গাছে নিম ফলই হয় মা, চিনির ডেলা ধরে না।"
> স্বর্ণের মায়ের এই ডাইনী অপবাদ লইয়াই লোকে দশকথা বলে, স্বর্ণ শুনিয়া ম্লান হাসি হাসে। [৩৭]

গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস স্বর্ণের মনোজগতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। স্বর্ণও একসময় ভাবতে শুরু করে যে তার মায়ের স্বভাব তার মধ্যেও আছে। মানুষের মনোজগত খুব অদ্ভুত, বিশ্বাস থেকে মানুষ অনেক কিছু করে। স্বর্ণও নিজেকে ডাইনী ভাবতে লাগল :

> ডাইনীরা সব দেখতে পায়। গর্ভিনীর গর্ভের ভ্রুণ, গাছের মুকুলের ফলÍ দেহের মধ্যে রক্ত, মাংস, হৃৎপিন্ড, প্রাণ স্পন্দন –সব তাহারা দেখিতে পায়।
>
> ক্ষণে ক্ষণে শরীর তাহার শিহরিয়া ওঠে! চিলটার চিৎকার তাহার দুর্বল মস্তিষ্কে অতি তীব্রভাবে আঘাত করিতেছিল। বিরক্ত হইয়া তালগাছের মাথার পানে চাহিল।

> স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল। ও কি? তালগাছটার উদ্গামোদ্যত ফলভার যেন সে দেখিতে পাইতেছে। ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া আবার সে চাহিল। সত্য সত্যই তো তাল গাছটির ভারী ফল সম্ভারের সূচনা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। [৩৮]

লোকবিশ্বাস, কুসংস্কার, অপবিশ্বাস মানুষের মনে এমনভাবে মায়াজাল বিস্তার করে যে সে তার বশবর্তী হয়ে নিজেই নিজের অজান্তে রহস্যময় আচরণ করতে থাকে। 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পটিতে মানব-মনস্তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

মেলা

(বঙ্গশ্রী, বৈশাখ ১৩৪০)

'মেলা' গল্পটিতে তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় অঞ্চলের লোকঐতিহ্যের অংশ হিসেবে মেলার চিত্র তুলে ধরেছেন। "উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা দীঘির চারি পাড় ঘিরিয়া মেলাটা বসিয়াছে। কোন পর্ব উপলক্ষ্যে নয়, কোন্ এক সিদ্ধ মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণের তিথিই মেলাটির উপলক্ষ্য।" [৩৯] এই মেলার বিস্তারিত বিবরণ গল্পকার পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মনিহারীর দোকান, মিষ্টির দোকান, খেলনার দোকানÍ সবই মেলায় আছে। একটি দশ-এগার বছরের ছেলে আর ছয়-সাত বছরের একটি মেয়ের দৃষ্টিকোণে এই মেলা চিত্রিত হয়েছে। এরা দুই ভাই-বোন। মেলার রঙিন আসরে দুই ভাই-বোন অভিভূত। ছোট বোন মণি মুগ্ধ হয়ে মেলার সাজসজ্জা, খেলনাÍ এগুলো দেখতে দেখতে ভাইকে হারিয়ে ফেলল। এই হারানো মণির সূত্র ধরেই বারবণিতা কম্‌লির আবির্ভাব এই গল্পে। রূপ-দেহ নিয়ে যারা ব্যবসা করে কম্‌লি তাদের একজন। মেলার একটি অংশে রয়েছে বাজির ঘর। এই বাজির ঘরে এসে দুই ভাই-বোন একে অন্যকে হারিয়ে ফেলে, মণি চলে আসে আনন্দ বাজার অর্থাৎ বেশ্যাপটীতে। এখানে কম্‌লির সঙ্গে মণির পরিচয় হয়। গল্পের ঘটনাংশ থেকে মেলার বিভিন্ন অংশের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আনন্দ বাজারের চিত্র ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে :

> অমর আর একটা জনতার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে ডাইস খেলা চলিতেছে। পয়সা টাকা জলস্রোতের মত ঝম্‌ঝম্ করিয়া পড়িতেছে। খেলোয়াড় হাঁকিতেছিলÍ
> এক টাকা দিলে দু'টাকা, দু'টাকায় চার টাকা!
> অমর ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিয়া গেল। আপনার পকেটে হাত দিয়া নাড়িতে আরম্ভ করিল। [৪০]

এভাবে মেলার খাবারের দোকান, খেলনার দোকান, বেশ্যাপটী, জুয়ার আসরÍ সবই একে একে উঠে এসেছে। এই মেলায় হারিয়ে যাওয়া মণিকে পেয়ে কম্‌লির মাতৃত্ব জেগে উঠে। একারণেই তার দলের মাসী যখন মণিকে দেহ-ব্যবসায় ব্যবহার করতে চায়, তখন কম্‌লি মণিকে নিয়ে অন্ধকার রাতে সেই আনন্দবাজার থেকে বের হয়ে যায়। মণিকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়াই ছিল কম্‌লির উদ্দেশ্য। মেলার ঝলমলে এবং কুৎসিতÍ দু'ধরনের রূপই এই গল্পে দেখানো হয়েছে।

বাউল

(অভ্যুদয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০)

'বাউল' গল্পের শুরুতেই তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় বাউল শ্রেণী সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। "বাউল মানুষ। পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো বহির্বাস। তাহার উপর অনাবরিত পরিপুষ্ট দেহ। সম্মুখের দুটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে পরিচয় পৃথিবীময় সে ছড়াইয়া বেড়ায়। বাউলের আগে হাসি পরে কথা।" [৪১] রাঢ় বাংলায় বাউল আর বোষ্টম কোথাও কোথাও এমন ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থান করে যে তাদের পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন হয়, অথচ বাউলরা ঠিক বোষ্টম বা বৈষ্ণব নয়। এই গল্পটি এরকম একজন বাউলকে নিয়ে, এই বাউল সাপের ওঝাগিরি জানত। সাপ এই গল্পে গুরুত্ব পেয়েছে কিন্তু বেদে বা সাপুড়ের গল্প নয় এটি। সাপের কামড়ে মৃতপ্রায় এক শিশুকে অলৌকিক ক্ষমতায় বাউল সুস্থ করে তোলে:

> বাউল আসন করিয়া বসিয়া নানা মন্ত্র অদ্ভুত সুরে আওড়াইতে আরম্ভ করিল। সে উচ্চারণ ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে যেন একটা মোহের সৃষ্টি করিতেছিল।
>
> সহসা মন্ত্রোচ্চারণ ক্ষান্ত করিয়া বাউল কহিলÍ এসেছিস ? আরে তুই যে নেহাৎ শিশু। এরই মধ্যেÍ নাঃ তোর আর দোষ কি বল্ ? ..... সকলে মনোযোগ সহকারে দেখিয়া দেখিতে পাইল একটি সর্পশিশু, গোখুরা সাপের বাচ্চা, বাউলের সামনে ছোট্ট ফণাটি তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। [৪২]

এভাবে বাউল অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার করে সাপটাকে নির্দেশ দিল দুধ খেয়ে তারপর শিশুকে আবার দংশন করার জন্য, সাপটাও সেই অনুযায়ী কাজ করল। সেই শিশুটিকে সুস্থ করে দেওয়ার পর একধরনের মায়া জন্মে যায় শিশুটির প্রতি, এই গ্রাম ছেড়ে বাউল চলে যেতে পারে না। শ্যামসুন্দরের

ভিটায় হঠাৎ করে পাওয়া একটি রূপার মুদ্রা ভরা ঘটি বাউলের জীবনের গতি পরিবর্তন করে দেয়। সেই রূপা দিয়ে বাউল শিশুটিকে মল, বালা বানিয়ে দেয়। কিন্তু রাতের পর রাত জেগে ধনসম্পদ খুঁজতে গিয়ে সাপের দংশনেই বাউলের মৃত্যু হয়।

বাৎসল্য রস-প্রধান বাউল গান এই গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে :

সাধে কি তোর গোপাল চাই গো
শোন যশোদে!
তোর গুণের কানাই কি গুণ জানেÍ
বনে অন্ন পাই গো শোন যশোদে! [৪৩]

এবং দ্বিতীয় গানটি হল:

ভাল ক'রে পড়গা ইস্কুলেÍ
নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে।
বড় ইস্কুল জেলা নদীয়া,
হেডমাস্টার দয়াল নিতাই কেলাসে দেয় তুলে! [৪৪]

আখড়াইয়ের দীঘি

(প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪০)

রুক্ষ রাঢ় বাংলার শুষ্ক প্রকৃতির উল্লেখ করে তারাশঙ্কর 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটি শুরু করেন। দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বিচার করার জন্য সরকারি লোক এসেছে। তাদের চলার পথে তারা খুঁজে পায় মৃত এক ব্যক্তিকে, তাকে থানায় নিয়ে যাবার পরে জানতে পারে যে মৃত ব্যক্তির নাম কালীচরণ বাগ্‌দি। জাতে বাগ্‌দি কিন্তু পেশায় ঠ্যাঙ্গাড়ে এই কালীচরণের করুণ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। কালীর পুর্বপুরষরা জাতে বাগ্‌দি হলেও নবাবের 'পল্টনে' কাজ করেছে। কোম্পানির আমলে পল্টনের কাজ চলে গেলে তারা জমিদারের লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করত। তবে জমিদারের কাজ করত লোকদেখানোর জন্য, প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষ হত্যা করে সম্পদ লুট করত।

বাগ্‌দিরা কৃষিকাজকে বা ধনী গৃহস্থের বাড়ির চাকরের কাজকে হীন মনে করে, মানুষ হত্যার মত দানবীয় কাজকে বীরত্বপূর্ণ কাজ মনে করে। কালীচরণের হিংস্রতার শিকার হয় তার নিজেরই ছেলে তারাচরণ। সম্পদ নিয়ে কলহের জের ধরে বাবার হাতে ছেলে খুন হয়। পুত্রবধূ এলোকেশীর সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে ছেলে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন দীপান্তরে কাটাতে হয় কালীচরণকে। গল্পে ভবিষ্যতবাণীতে বিশ্বাস দেখা যায়। কালীর বাবা বলেছিলেন "আমাদের বংশ থাকবে না - নিব্বংশ

হতেই হবে।" [৪৫] গল্পের শেষে দেখা যায় মানুষের প্রাণ-হরণকারী দুর্ধর্ষ কালীচরণের আখড়াইয়ের দীঘিতে করুণ মৃত্যু ঘটে খাদে পড়ে ঘাড় ভেঙ্গে।

এই গল্পে ঘাঁটি খেলা নামে এক খেলার কথা বলেছে এলোকেশী :

> হুজুর ডাকাতি করতে গিয়ে যেমন লাঠি খেলে, গেরস্তের ঘর চড়াও করে বাইরের লোককে আটকে রাখে, সেই খেলার নাম ঘাঁটি-খেলা। [৪৬]

নারী ও নাগিনী

(দেশ, শারদীয়া ১৩৪১)

রাঢ় বাংলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাপের ওঝাও রয়েছে। বিচিত্র পেশাজীবী মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য উপস্থাপন তারাশঙ্করের ছোটগল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে আমরা সাপের ওঝা খোঁড়া শেখকে দেখতে পাই। বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর বেদে আছে যারা সাপের ওঝা, ভ্রাম্যমান বেদেদের থেকে এদের জীবনাচরণ একটু আলাদা। এরা কখনও কখনও ঘর বাঁধে, হয়তো সে ঘর দীর্ঘস্থায়ী হয়নাÍ তবুও সেটা ঘর বা ঠিকানা। বেদেরো সাধারণত স্বাধীনচেতা বন্ধনহীন জীবনযাপন করে। এ গল্পের খোঁড়া শেখকে দেখা যায় জোবেদা নামের এক নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের বসতবাড়ি-সংসার আছে। সাপ ধরে খেলা দেখান এদের প্রধান পেশা :

> উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ বড় পাওয়া যায় না। ধরতে পারলে কিছু রোজগার হতরে।
>
> খোঁড়া সাপের ওঝা। শুধু ওঝা নয়, সাপ লইয়া খেলাও সে করে। ঘরের চালের কানাচে বড় বড় মুখ বন্ধ হাঁড়ি তাহার খাটানোই আছে। তাহারই মধ্যে সাপগুলিকে সে বন্দী করিয়া রাখে। জীর্ণ হইলে দূর মাঠে গিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া আসে। কত সাপ মরিয়াও যায়। সাপ যখন থাকে, তখন খোঁড়া মজুর খাটে না। তখন দেখা যায়, বিষম-ঢাকি ও তুবড়ি বাঁশী লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে। রোজগারও মন্দ হয় না। [৪৭]

খোঁড়া এই উদয়নাগ সাপিনীটিকে ধরে ফেলে এবং নাকে একটা মিনি পরিয়ে দেয়। খোঁড়ার স্ত্রী জোবেদা এই সাপটিকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু খোঁড়া দুষ্টুমি করে এই সাপটিকে নিকা করে, বিবি বলে সম্বোধন করে :

> খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটি লাল রেখা তাঁকিয়া দিল। তারপর হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে অমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল। [৪৮]

ওঝারা শুধু সাপের খেলা দেখায় না, সাপ ধরে কাছে রাখার কারণে পরিবারের সদস্যদের মতই মনে করে। গল্পের শেষে দেখা যায় উদয়নাগ সাপিনীটির ছোবলে জোবেদার মৃত্যু হয়।

তারিণী মাঝি

(আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৪২)

'তারিণী মাঝি' গল্পটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি শিল্পসফল রচনা। তারিণী ময়ূরাক্ষী নদীর মাঝি, তার পেশাগত জীবন এবং দাম্পত্যজীবন দুটোই এই গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে। মাঝি আর নদীর সম্পর্ক খুব গাঢ়; নদীর গতি-প্রকৃতি, জোয়ার-ভাটা, টান-স্রোত সবই মাঝিরা সময় এবং পরিস্থিতি বুঝে বলে দিতে পারে। ময়ূরাক্ষী নদীতে বার মাসের মধ্যে সাত আট মাসই পানি থাকে না, এক-দেড় মাইল শুধু বালি দেখা যায়। কিন্তু বর্ষার শুরুতে নদী রাক্ষসীর মত ভয়ংকরী এবং খরস্রোতা হয়ে ওঠে। গল্পের শুরুতে দেখা যায় তারিণী দক্ষ সাতারুও বটে, গাঁয়ের এক বধূ নৌকা থেকে পড়ে গেলে তারিণীই তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে নিরাপদে ডাঙায় ফেরে। এই উপকারের প্রতিদান দিতে চাইলে তারিণী আট আনা চায়। সে বলেÍ "এক হাঁড়ি মদের দাম-আটআনা।" [৪৯] নিম্নবিত্ত লোকজীবনে নেশার প্রচলন সম্পর্কে এখানে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

তারিণীর স্ত্রীর নাম সুখী, তাদের সুখের সংসারে অন্ন-বস্ত্রের অভাব হয় না এই ময়ূরাক্ষী নদীর কল্যাণেই। নদীর অবদান প্রসঙ্গে গল্পে উল্লেখ রয়েছে :

> ওই ময়ূরাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। দশহরার দিন ময়ূরাক্ষীর পূজাও সে করিয়া থাকে। এবার তেরশত বিয়াল্লিশ সালে দশহরার দিন তারিণী নিয়মমত পূজা-অর্চনা করিতেছিল। তাহার পরনে নূতন কাপড়, সুখীর পরনেও নূতন শাড়িÍ ঘোষ মহাশয়ের দেওয়া পার্বণী। জলহীন ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছিল। [৫০]

ময়ূরাক্ষী নদীতে বান না এলে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ফসল ফলানো যায় না। নদীর বহন করা পলিমাটিতে ফসল ফলে। পূজায় এই কারণে পাঁঠা বলি দেয় তারিণী। পূজার পরেই আবার সে

মদ্যপান করে। গল্পের শেষে দেখা যায় যে ময়ূরাক্ষী নদীতে বন্যা হয় এবং সেই বন্যায় সুখী ডুবে মারা যায়। তারিণী সুখীকে উদ্ধার করতে চায় কিন্তু যখন তার নিজের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে সুখীর কারণে, তখন সে সুখীর গলা পিষ্ট করে সুখীকে ছাড়িয়ে নিজের জীবন বাঁচায়।

মতিলাল

(প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪২)

'মতিলাল' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দুজন কুৎসিত চেহারার নর-নারীকে উপস্থাপন করেছেন। সমাজের সামগ্রিক একটি রূপ তুলে ধরার অভিপ্রায় থেকে তিনি রূপবান বা রূপবতী এবং সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কদাকার মানুষকেও তাঁর গল্পের উপজীব্য করেছেন। এই গল্পে অন্ত্যজ সমাজের ধর্মীয় উৎসব গাজনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন লেখক। 'চোত পরব'–এর গাজন এবং ধর্মপূজার লৌকিক রূপ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। গাজন উৎসব পালিত হয় শিব, নীল ও ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতাদের নিয়ে। চৈত্র মাসে শিবের গাজন হয়, জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ় মাসে ধর্মের গাজন হয়। হাড়ি, বাগ্‌দি, ডোম, কর্মকার প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ এই উৎসব পালন করে থাকে।

এই গল্পে গাজনের সং বের হয়। শোভাযাত্রার মধ্যে বুড়ো শিবের দোলা সামনে আর পিছনে সঙের দল থাকে, ঢাকঢোল বাজানো হয়। বিভিন্ন পশু বা পেশার মানুষ সাজে সঙের দল। মতিলাল এই দলে ভালুক সেজে অংশগ্রহণ করে। সে আর কোন কাজ করে না মাঝে মাঝে সং সাজা ছাড়া। এই গাজন উৎসবের পর রাঢ় দেশে ধর্মরাজের পূজা হয়। এই পূজা লেখক সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন:

> রাঢ় দেশ। বৈশাখ মাসে বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজা, নিম্নজাতির এক বিরাট উৎসব। মতিলালের গ্রামে, মহুগ্রামে ধর্মরাজের পূজার উৎসবে প্রচুর ধুমধাম হয়। মহুগ্রামের ধর্মদেবতা নাকি ভারি জাগ্রত। চার-পাঁচখানা গ্রামের নিম্নজাতির সকলেই এই ধর্মরাজের পূজা-অর্চনা করে। এবার উৎসবের আড়ম্বর খুব বেশি। পাশের বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্বর্ণকাররা পাল্লা দিয়া নাকি উৎসব করিবে ! এবার ঢাক আসিল ত্রিশটা। মহুগ্রামে বরাদ্দ হইয়াছে পঁয়ত্রিশটা। সংবাদটা কিন্তু গোপন রাখা হইয়াছে। ওগ্রামের ভক্তের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ পূর্ণ করিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে। মহুগ্রামের ভক্তের সংখ্যা ষাট ছাড়াইয়া গেছে। [৫১]

ধর্মপূজা সংশ্লিষ্ট লৌকিক প্রথা-পূজা-আচার এসবই তারাশঙ্কর এই গল্পে তুলে ধরেছেন। প্রথমত শুধু ডোমরা ধর্মরাজের পূজা করত, পরবর্তীতে হাড়ি, বাউরি, মুচি, বাগ্‌দিদের মধ্যেও এই পূজার প্রচলন ঘটে। লৌকিক ধারণামতে ধর্মরাজ পুত্রহীনকে পুত্র দিতে পারেন, অনাবৃষ্টির সময়ে বৃষ্টি দিতে পারেন, অত্যাচারীকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত করে দিতে পারেন, অন্ধের চোখে আলো দিতে পারেন এবং বাত রোগীকে ভাল করে দিতে পারেন। এজন্য লোকসমাজে সে বহু-পূজিত। এই গল্পে ধর্মপূজার বিভিন্ন নিয়ম বা আচার বর্ণনা সহযোগে উপস্থাপিত হয়েছে :

> সার্ধ দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্বে যে তিথিতে অর্ধ জগতের ধর্মগুরু মহামানব বুদ্ধ সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া স্নানান্তে মরণ-পণে তপস্যায় বসিয়াছিলেন, সেই পূর্ণিমার ঠিক প্রথম লগ্নে উৎসবের প্রারম্ভ। সেই দিন হয় মুক্তিস্নান।
> দলে দলে ভক্তরা 'মুক্তচান' করিয়া উত্তরী পরিতেছিল। ঢাকের বাজনায় সচকিত পাখির দল কলরব করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, কোনো স্থানে বসিতে তাহাদের সাহসই ছিল না। হনুমানের দল ও দ্রুতবেগে বিপুল শব্দ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতেছিল। .....
> পরদিন পূর্ণিমার অবসান-সময়ে ব্রতের উদযাপন। ঢাক শিঙা কাঁসি কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খবাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। প্রথমেই একদল ডাক ও বাদ্য, তাহার পরেই শ্রেণীবদ্ধভাবে বারো চৌদ্দ সারি ভক্তের দল ভাঁড়ল মাথায় করিয়া চলিয়াছে। ভাঁড়ল এক-একটি জলপূর্ণ মঙ্গল-কলস। কলসগুলির গলায় ফুলের মালা; ভক্তের দলেরও প্রত্যেকের গলায় মোটা মোটা কন্ধে আউচ ও গুলঞ্চ ফুলের মালা। ভক্তদলের চারিপাশে সারি সারি ধুপদানি হইতে ধুপের ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহারা ঢাকের বাজনার তালে তালে ভক্ত নাচ নাচিয়া চলিয়াছে। আবার পিছনে একদল ঢাক। তাহার পিছনে দশখানা গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নরনারী কাতারে কাতারে চলিয়াছে। [৫২]

এই ধর্মরাজের উৎসবে ভীষণ-রূপের মতিলালকে দেখে একটি বালক ভয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। মতিলাল 'ঝাঁটাবুড়ি' সেজেছিল,ছোট ছেলেরা তাকে দেখে ভয় পায় বলে গ্রামে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় মতিলালের। মতিলালের সন্তান হয়না বলে সে ধর্মমন্দিরে তত্ত্বাবধায়ক দেবাংশীর কাছ থেকে মাদুলি নিয়ে এসে তার স্ত্রী ভুবনকে পরায়। পরে সে তার স্ত্রীর সন্তানলাভের জন্য বাঁধা মাদুলি খুলে ফেলে। কারণ তাদের সন্তান হলে সেও তাদের মতোই কুৎসিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীক্ষা

(কেশরী শারদীয়া, ১৩৪৩)

'প্রতীক্ষা' গল্পের প্রধান চরিত্র পরী নামের একটি বাউরি মেয়ে। নিয়ম-শৃঙ্খলার জীবনে সে অভ্যস্ত নয়। মানুষের মন নিয়ে সে খেলা করে। সাধারণ দিনমজুরের মধ্যে যারা পরীকে কামনা করে, পরী তাদের কাছে সোনার গয়না চায়। কিন্তু দিতে না পারায় পরী তাদের কারোরই ঘরনী হয় না। পরীর পরিচ্ছদের বিবরণ পাওয়া যায় :

> পরী গাল টপ করিয়া আলগোছে একটা পান ফেলিয়া চওড়া লালপেড়ে মিহি শাড়িখানি পরিয়া ঝুড়ি–কাঁখে রাজমিস্ত্রী গনি মিঞার কাছে রোজ খাটিতে যায়। থাকবন্দী ইট মাথায় অবলীলাক্রমে মই বাহিয়া উঠিতে উঠিতে গান গায়Í
> মিহি শাড়িখানি পরিতে না জানি, না জানি বাঁধিতে কেশ।
> পরীর শাড়ির মূল্যের মহার্ঘতা লইয়া পাড়ায় তর্ক হয়। তাহার চাল চলনের সমালোচনা করা হয়। অবশেষে একদিন বাউরী–পঞ্চায়েত প্রকাশ্যভাবে পরীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাহার পিতাকে ডাকিয়া সমাজচ্যুত করিয়া দিল। [৫৩]

কিন্তু সমাজচ্যুত হয়েও পরীর আচরণে কোনো পরিবর্তন আসেনি। বাউরি সমাজের ভাঁজো উৎসবে পরীর স্থান হল না সমাজপতিদের নির্দেশে। "ভাদ্র মাসে ইন্দ্রপূজার সময়েই 'ভাঁজো পরব'– নৃত্যে গীতে সুরে সঙ্গীতে এই বাউরী জাতি সুররাজের উপাসনা করে। --------- ফুলে পাতায় মণ্ডপ সাজাইয়া ইন্দ্রদেবতার বেদী প্রস্তুত করে। ঢোল কাঁসি বাজাইয়া মেয়েরা গান গাহিতে গাহিতে জল ভরিতে যায়; তাহারা চুলে পরে শালুক ফুলের মালা, গলায় দোলায় লাল সাদা হরগৌরী ফুলের হার।Í পরী এবার 'সাজার ভাঁজো'য় স্থান পাইল না।" [৫৪] সমাজের নিষেধে পরী দমে না গিয়ে নিজের বাড়ির উঠানে ভাঁজো উৎসব করে। স্বৈরিনী স্বভাবের পরী নিজের বাড়ির উঠানে আখনা নামের যুবকের সঙ্গে নাচে–গানে মেতে ওঠে। পরীর উঠানে অনুষ্ঠিত 'ভাঁজো উৎসব' পালনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক:

> বলিয়া সে বাড়িতে আসিয়া ভাঁজোর মণ্ডপ সাজাইয়া তুলিল, ঢোল-কাঁসির বায়না দিল।
> পূজার দিন।
> ঢোল ও কাঁসির বাজনার সঙ্গে মেয়েদের গানে ভাদ্র মাসের সজল সন্ধ্যা মুখরিত হইয়া উঠিল।

পরীর উঠানে আলোর আড়ম্বরে উৎসবের সমারোহ। সে একটা হেজাক বাতি জ্বালাইয়াছে। পানওয়ালা নাক-কাটা ফকিরের কাছে আট আনার আলোটা সে ভাড়া করিয়া আনিয়াছে। উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে বিলাসিনী পরী গান গাহিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে সমাজচ্যুতের ঘরে সমাজ জমিয়া উঠিল।

বাজনদার ঢুলীটারও নেশা জমিয়াছে। তালের পরিবর্তে বেতাল তাহার ঘাড়ে ভর করিয়া বসিয়াছে, ঘন ঘন তাহার বাজনায় তাল কাটিতেছিল। অকস্মাৎ গানটার শেষের মুখে রঙ্গিণী পরী পায়ের ধূলা তুলিয়া ঢুলীটার মুখে ছিটাইয়া দিল।

ও-ধার হইতে আখনা উঠিয়া আসিয়া ঢুলীটার কাঁধ হইতে ঢোলটা কাড়িয়া লইয়া কাঁধে ঝুলাইয়া কাঠি দিলÍ কুড়ুতাং-কুড়ুতাং-কুড়ুম্ কুড়ুম। সঙ্গে সঙ্গে আখনা ওরফে রাখনা ওরফে রাখহরি গানও ধরিয়া দিলÍ

ও কালো কালিন্দী–কুলে কালো কানাই বাজায় বাঁশি
আমি কুলে কালি দিব কালো রূপই ভালবাসি।

পরী উত্তরে গান ধরিলÍ

কে বলে রে কে বলে রে আমার ভাঁজো কালো
লায়ে থেকে আনব সিঁদুর ভাঁজো করবে আলো।

আখনা গাহিলÍ

তোর ভাঁজোতে মোর ভাঁজোতে পাতিয়ে দেব সই
গয়না কিন্তু লারব দিতে মুড়কীমালা বই

পরী উত্তর দিলÍ

মুড়কীমালা তোরই থাকুক গুড়-মাখানো খই
আমি বরং দোব কিনে পয়সাটাকের দই। [৫৫]

পরে পরী আখনার সঙ্গে সংসার বাঁধে, পরীর বিলাসিতার কারণে আখনা চুরিও করে, তবুও তাদের সংসার স্থায়ী হয় না। পরী আখনাকে ছেড়ে চলে যায় আর চুরির দায়ে আখনার জেল হয়। দুই বছর জেল খেটে আখনা লোকমুখে পরীর মুসলমান হওয়ার খবর পায় এবং কলকাতায় যায় তাকে খুঁজতে। কিন্তু কয়েকবছর সেখানে থেকে অর্থ উপার্জন করে আবার গ্রামে ফিরে আসে। পরীকে সে কলকাতায় খুঁজে পায়নি। কাটোয়াতে গিয়ে পরীকে সে খুঁজে পেয়েছে কিন্তু রোগজর্জরিত, শীর্ণ, কুরূপা, দৃষ্টিহীন পরীকে সে একটি মাত্র পয়সা ভিক্ষা দিয়ে চলে এসেছে। যার জন্য এত দিনের প্রতীক্ষা, তাকে পাওয়ার পরও আখনা তাকে গ্রহণ করে না। কারণ আখনার প্রতীক্ষা ছিল যৌবনবতী-সুস্থ-সুদর্শনা পরীর জন্য। বিগতযৌবনা, অসুস্থ, কদাকার, জীর্ণ, শারীরিক প্রতিবন্ধী পরীর জন্য সে অপেক্ষা করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ডাক-হরকরা

(প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩)

'ডাক-হরকরা' গল্পের দীনু ডোম পোস্ট-অফিসের চিঠি বহন করে অর্থাৎ রানার। স্মরণ করা যেতে এই রানারকে নিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭) 'রানার' নামে একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। এই রানার অর্থাৎ ডাক-হরকরা শ্রেণীর একজন মানুষকে রাঢ় বাংলার পটভূমিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থাপন করেছেন এই গল্পে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র দীনু ডোম, বংশানুক্রমিকভাবে ডোম হলেও জীবিকাসূত্রে সে ডাক-হরকরা। পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে অনেক ডোম বিভিন্ন পেশায় জীবিকানির্বাহ করে। গল্পে নোটন ডোম বলে একজন রয়েছে যে চৌকিদারির কাজ করে। দীনু ডোমকে দেখা যায় মদ্যপান করতে। সারা রাত পোস্টঅফিসের দায়িত্ব পালন করে ঘরে ফিরে মদ গিলেই আবার চাষের জমিতে আল কাটতে যায়। জমির আল কাটতে গিয়ে সে বৃষ্টির জমা জল থেকে কই-মাগুর মাছ ধরে। লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবনের এই সব ছোটখাটো ব্যাপারগুলো তারাশঙ্কর সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দীনু সৎ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলেও তার ছেলে নিতাই ডাকাতি করে মানুষের ক্ষতি করেছে। ব্যাংক ডাকাতি, মানুষকে লাঠি মারাÍ এসব অপরাধ নিতাই করেছে বলে পুলিশকে দীনু জানিয়েছে। পেশাগত জীবনেও দীনু সৎ। কখনো রাস্তায় এক মুহূর্তের জন্য দেরি করেনি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাকে থামাতে পারেনি। ঝড়-বৃষ্টি সব অগ্রাহ্য করে সে তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। আর তার ছেলে নিতাই বাবাকে (দীনুকে) আঘাত করে ডাক লোটার চেষ্টা করেছে, কিন্তু দীনু তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করার জন্য ছেলেকেই ধরিয়ে দিয়েছে।

গল্পের শেষে দেখা যায় নিতাইয়ের মৃত্যুর খবর দীনুই বয়ে নিয়ে এসেছে। নিতাই বিদেশী জাহাজে খালাসীর চাকরি নিয়েছিল, সে মারা গেলে তার ইনসিওর করা টাকা সে বাবাকে পাঠাতে বলেছিল। ছেলের মৃত্যুর খবর বয়ে নিয়ে আসার পর সে আর ডাক-হরকরার কাজ করেনি।

গল্পের মধ্যে সুন্দীপুরের বটতলার উল্লেখ আছে। রাঢ়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এটি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে গ্রাম্য লোকজ পটভূমিতে বটতলা অনেক গুরুত্ব পায়। বটগাছ বা বটতলাকে কেন্দ্র করে বা সাক্ষী করে নানা উপকথা, লোককথা রচিত হয়ে দিকে দিকে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে।

তথ্যপঞ্জি ঃ

১. 'স্রোতের কুটো', *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড*, সম্পাদক: অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০০০) পৃ ১

২. 'স্রোতের কুটো', প্রাগুক্ত, পৃ ১৩

৩. 'স্রোতের কুটো', প্রাগুক্ত, পৃ ১৫

৪. 'রসকলি', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫-৩৬

৫. 'রসকলি', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮

৬. 'রসকলি,' প্রাগুক্ত, পৃ ৪১

৭. 'রসকলি', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬

৮. 'হারানো সুর', প্রাগুক্ত, পৃ ৫১

৯. 'চোখের ভুল', প্রাগুক্ত, পৃ ৭০

১০. 'চোখের ভুল', প্রাগুক্ত, পৃ ৭১

১১. 'চোখের ভুল', প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪

১২. 'চোখের ভুল', প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭

১৩. 'চোখের ভুল', প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮

১৪. 'চোখের ভুল', প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬

১৫. সফিকুন্নবী সামাদী, *তারাশঙ্করের ছোটগল্প ঃ জীবনের শিল্পিত সত্য* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪) পৃ ২২

১৬. 'চোখের ভুল', প্রাগুক্ত, পৃ ৭২

১৭. 'রাইকমল', প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬

১৮. 'রাইকমল', প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭

১৯. 'রাইকমল', প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮

২০. 'রাইকমল', প্রাগুক্ত, পৃ ১২২

২১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার কালের কথা', *তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড*, (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কার্তিক ১৩৮৮) পৃ ৪৩৯

২২. 'মরুর মায়া', প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩

২৩. 'মরুর মায়া', প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৩

২৪.‘প্রসাদমালা’, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২

২৫.‘প্রসাদমালা’, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩

২৬.‘প্রসাদমালা’, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪

২৭.‘প্রসাদমালা’, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬

২৮.‘প্রসাদমালা’, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬

২৯. সফিকুন্নবী সামাদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪

৩০.‘মালাচন্দন’, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯

৩১.‘মালাচন্দন’, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০

৩২.‘মালাচন্দন’, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১

৩৩.‘মালাচন্দন’, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৬

৩৪.‘সর্বনাশী এলোকেশী’, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৪

৩৫.‘সর্বনাশী এলোকেশী’, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৫

৩৬.‘সর্বনাশী এলোকেশী’, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৪

৩৭.‘ডাইনীর বাঁশি’, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৮

৩৮.‘ডাইনীর বাঁশি’, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩১

৩৯. ‘মেলা’ প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৬

৪০.‘মেলা’ প্রাগুক্ত, পৃ ২৪২

৪১.‘বাউল’ প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৬

৪২.‘বাউল’ প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৯

৪৩.‘বাউল’ প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৭

৪৪.‘বাউল’ প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৮

৪৫.‘আখড়াইয়ের দীঘি’, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৩

৪৬. ‘আখড়াইয়ের দীঘি’, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯১

৪৭.‘নারী ও নাগিনী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৮

৪৮. ‘নারী ও নাগিনী’, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭০

৪৯. ‘তারিণী মাঝি’, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৯

৫০. ‘তারিণী মাঝি’, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬১

৫১. ‘মতিলাল’, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯১

৫২. ‘মতিলাল’, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯২

৫৩. ‘প্রতীক্ষা’, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭১

৫৪. ‘প্রতীক্ষা’, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭১

৫৫. ‘প্রতীক্ষা’, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পর্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ

(১৩৪৪-১৩৫৩)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল ছোটগল্পভাণ্ডারের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলো এই পরিচ্ছেদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' থেকে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের মাঘে প্রকাশিত 'আরোগ্য' পর্যন্ত এই পর্যায়ের গল্পসংগ্রহ। এই গল্পগুলোর মধ্যে যেসব গল্পে লোকজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে সেই গল্পগুলো এই পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। লোকজীবনের সহজ বাস্তবতা বর্ণনা ও ঘটনা সহযোগে বর্ণিত হয়েছে লেখকের সাবলীল দক্ষতায়। রাঢ় এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনাচরণ উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে। প্রতিমা-কারিগর, মালাকার, বেদে, বৈষ্ণব, পটুয়া, বাজিকর, চাষী প্রভৃতি গোষ্ঠীর জীবনচিত্র যেসব গল্পে রূপায়িত হয়েছে সেগুলো এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। লোকের অপবিশ্বাসের কারণে ডাইনী হয়ে ওঠার প্রসঙ্গও রয়েছে। 'প্রতিমা' গল্পে প্রতিমা গড়ার কারিগর, 'মালাকার'-এর মালাকার, 'ট্রিটি' গল্পে শাক্ত ও বৈষ্ণব, 'বেদেনী'-র বেদের মেয়ে, 'ডাইনী'-র ডাইনী-স্বভাব সমৃদ্ধ নারী, 'রাঙাদিদি'-র পটুয়া, 'পিঞ্জর' গল্পে বাজিকর, 'চোর' গল্পে চোর, 'কবি'-র কবিয়াল, 'একরাত্রি' গল্পে সন্ন্যাসী, 'যাদুকরী'-র বেদের মেয়ে, 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পে চাষী, 'তমসা'-র খেমটা দলের নারী আর অন্ধ ভিখারী এইসব বিচিত্র চরিত্র সমন্বিত ভাবে রাঢ়ের বৃহত্তর লোকজীবনের পরিচয়ে তুলে ধরেছে। যে সব গল্পে লোকজীবনের বিস্তৃত প্রকাশ ঘটেছে সেই গল্পগুলো আমাদের এই আলোচনার পর্যায়ভুক্ত।

প্রতিমা

(আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৪৪)

'প্রতিমা' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমা গড়ার মধ্যে দিয়ে জীবনগড়ার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে চাটুজ্জে বাড়ির ছোটবউ যমুনা, তার স্বামী অমূল্য অর্ধোন্মাদ। নির্যাতন এবং সোহাগ দুটোই সে করে, সাধারণ নির্যাতনকারী স্বামী সে নয়। ফুলশয্যার রাতে যমুনাকে প্রহার করে অমূল্য বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। এ ঘটনার কয়েকদিন পর গঙ্গাস্নানে গিয়ে এক মহিলাকে অত্যাচারিত হতে দেখে অত্যাচারীকে হত্যা করে কয়েক বছরের জন্য অমূল্য জেল খাটে। কার্য-কারণ সূত্রে অমূল্যকে বিচার করা যায় না। অমূল্যর এইসব আচরণের কারণে যমুনার ওপরে অনেক

বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বাড়িতে পূজার অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে তার অংশগ্রহণের ব্যাপারেও বিধিনিষেধ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গল্পের শুরুতেই গৃহস্থ বাড়ির পূজার প্রস্তুতির একটি চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পকার:

> ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি সময়।..... গৃহস্থবাড়িতে পূজার কাজ পড়িয়া গেছে, মাটির গোলা গুলিয়া ঘর নিকানোর কাজটাই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে, ওইটাই হইল মোটা কাজ এবং হাঙ্গামার কাজ। তাহার পর খড়ি ও গিরিমাটি দিয়া দুয়ারের মাথায় আলপনা দেওয়া আছে, খই মুড়ি ভাজা আছে, মুড়কি নাড়ুর ভিয়ান আছে। পূজার কাজের কি অন্ত আছে। .....
> আজ চাটুজ্জে-বাড়িতে প্রথম মাটির 'ছোঁচ' পড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপে কারিগর আসিয়া গেছে, প্রতিমাতে আজ প্রথম মাটি পড়বে। [১]

চাটুজ্জে বাড়িতে পূজার প্রস্তুতির সূত্র ধরে তারাশঙ্কর এই পূজার আরেকটি রীতি উপস্থাপন করেছেন। সেটা হল পূজার সময় প্রতিমাতে দেহব্যবসায়ী নারীর বাড়ি বা উঠানের মাটি দিতে হয়। এই মাটি সংগ্রহ করার জন্য প্রতিমা-কারিগর কুমারীশ ডোমপল্লীতে যায়। "গণ্ডগ্রাম হইলেও পল্লীগ্রাম, এখানে শহর-বাজারের মতো প্রকাশ্যভাবে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কোনো রূপোপজীবিনী বাস করে না, তবে নীচ শ্রেণীর জাতির মধ্যে কলঙ্কিনীর অভাব নাই। গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণাংশে ডোমপল্লী, এই ডোমেদের পুরুষেরা করে চুরি, মেয়েরা করে দেহ লইয়া বেসাতি। মা-বাপ লইয়া সংসারের গৃহাচ্ছাদনের আবরণ দিয়া প্রকাশ্যেই তাহারা সব করিয়া থাকে।" [২]

প্রতিমা-কারিগর রাঢ় বাংলার ঐতিহ্যবাহী একটি শ্রেণী। এই শ্রেণী গ্রামবাংলার পূজা উৎসবে প্রতিমা গড়ে দেয়। পূজার সময় বিভিন্ন গৃহস্থবাড়ির প্রতিমা তৈরি করার বায়না নেয়। কুমারীশ একজন প্রতিমা কারিগর। এই গল্পে দেখা যায় সে সাতাশটি প্রতিমা তৈরি করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ গল্পে প্রতিমা তৈরির বিভিন্ন ধাপ উঠে এসেছে। দশদিন পর প্রতিমায় 'দুমৃত্তিকা' অর্থাৎ তুষ-মাটির ওপর কালো মাটি ও ন্যাকড়ার প্রলেপ লাগিয়ে প্রতিমার মুখ, হাত, পা, আঙুল জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর কারিগরদের সাহায্যে অলঙ্কার তৈরি করা হয়, প্রতিমার পরনের কাপড় প্রস্তুত করা হয়, প্রতিমার চোখ, মুখের অবয়ব কাঠির সাহায্যে চিহ্নিত করা হয় এবং সবশেষে বিসর্জনের দিন প্রতিমা ভাসিয়ে কারিগরেরা তাদের পারিশ্রমিক আদায় করে ।

চাটুজ্জে বাড়ির ছোটবউয়ের দুঃখ কারও চোখে ধরা না পড়লেও কুমারীশের চোখে ধরা পড়ে। নিজের অজান্তেই ছোটবউয়ের চেহারার আদলে প্রতিমার মুখাবয়ব তৈরি করে কুমারীশ, অবচেতন মনে

ছোটবউয়ের মুখটা গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু যমুনা অর্থাৎ ছোটবউ যখন জানতে পারল প্রতিমার মুখটি অবিকল তার মুখের মতো, তখন সে আত্মহত্যা করল। গ্রামে কলঙ্ক রটে গিয়েছিল; তার বাড়ির সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে গ্রামে এখন তাদের নিয়ে কুৎসা রটানো হবে, তাই যমুনা আত্মহত্যা করে সংসার থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল। প্রতিমা গড়ার মধ্যে দিয়ে কুমারীশ ছোটবউয়ের জীবন গড়তে চেয়েছিল কিন্তু প্রতিমা বিসর্জনের মতো যমুনার জীবনও হারিয়ে গেল।

মালাকার

(শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৫)

রাঢ় বাংলার হিন্দু সমাজের নির্দিষ্ট সম্প্রদায় মালাকার শ্রেণীকে তারাশঙ্করের 'মালাকার' গল্পে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিমা গড়ার শিল্পী প্রতিমা গড়ে দিয়ে যাওয়ার পর প্রতিমাকে যারা শোলা, চুমকি, রাংতা দিয়ে সাজায় তাদের মালাকার বলা হয়। বংশানুক্রমিকভাবে এই গ্রামীণ পেশার সঙ্গে জড়িত মালাকাররা। প্রতিমা সাজানোটা তাদের কাছে একটা শিল্প। গল্পে রজনীর এই শিল্প-দক্ষতা তুলে ধরা হয়েছে :

> রজনীও আসিয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হ্যারিকেনটি তুলিয়া ধরিয়া বেশ নিবিষ্টচিত্তে প্রতিমাখানি একবার দেখিয়া লইল। তারপর চাঙারির কাপড় খুলিয়া বাহির করিল সোনালী রূপালী লাল সবুজ রাংতার আভরণগুলি। একখানা কাপড় মাটির উপর বিছাইয়া তাহার উপর আভরণগুলি থাকে থাকে সাজাইয়া ফেলিয়া আবার মালসাটা টানিয়া লইয়া আঠা মাখাইতে মাখাইতে গুন গুন করিয়া গান ধরিলÍ
>
> হাতে দিব বাজুবন্ধ গলাতে সাতনর
> চরণে বাজিবে মল ঝমর ঝমর। [৩]

এই গল্পের রজনী মালাকার শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে বটে কিন্তু সকল মালাকার যে এরকমই হবে তা ভাবা যুক্তিসংগত নয়। রজনী মালাকারের স্বভাবের উচ্ছৃখলতা গল্পের কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় :

> অনিয়ম, উচ্ছৃখলতা ও স্বেচ্ছাচারের উন্মত্ত আনন্দের আস্বাদ রজনী যে কেমন করিয়া পাইয়াছিল, তাহার নির্দিষ্ট কোন ইতিকথা নাই। তবে সে পাইয়াছিল। দেশে একটা কথা প্রচলিত আছেÍ কারিগরের পাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আছে, নাই কেবল ভাত। অর্থাৎ পঞ্চাশ ব্যঞ্জনেই তাহাদের সর্বস্ব ব্যয়িত হইয়া গিয়া অন্নের বেলাতেই অভাব ঘটিয়া

> যায়। অপব্যয়টা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। রজনীরাও বংশানুক্রমে ডাকসাজ ও আতসবাজির কারিগর। এ উচ্ছৃঙ্খলতাটাও বংশানুক্রমিক। [৪]

রজনীর পিতামহ, পিতা সবাই নেশায় এবং নারীতে আসক্ত ছিল, রজনীও তাই। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে লাগামহীনভাবে জীবনযাপন করে। সে বিবাহ করে নাই, সেই ইচ্ছাও নাই। উপার্জন করে খরচ করে ফেলা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পৈত্রিক সম্পত্তিগুলো একে একে নামমাত্র ঋণ বা খাজনা বাকির দায়ে নিঃশেষিত। রজনীর তাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। হাতে অর্থ পেলেই অভিসারে চলে যায়। সে অর্থ নিঃশেষ করে নিঃসম্বল হয়ে ফিরে আবার কাজে লাগে। তবে তার হাতের ডাকসাজের মত এমন ডাকসাজ কারও হাতে তৈরি হয় না। আতসবাজিতেও তার জুড়ি মেলেনা। তার ফানুস কখনো জ্বলে যায়নি, রাতের আকাশের অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে সেগুলো হারিয়ে যায়। হাউইবাজির রং-ও তার সবচেয়ে বিচিত্র।

এই গল্পে বিলেতি পণ্য বর্জনের ঐতিহাসিক ঘটনাটি তারাশঙ্কর প্রাসঙ্গিকভাবে নিয়ে এসেছেন। এর ফলে রজনীর কয়েক পুরুষের ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হলো।

> কিন্তু অকস্মাৎ রজনীর সে দম্ভ একদা চূর্ণ হইয়া গেল। স্বরাজ স্বরাজ করিয়া সমস্ত দেশটা যেন পাগল হইয়া উঠিল। ছেলেরা দলে দলে জেলে যাইতেছে; পুলিশ আসিয়া ঘরবাড়ি তছনছ করিয়া দেয়; ছেলেদের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়ে, তবু তাহারা বন্দেমাতরম বলিতে ছাড়ে না; শুধু বন্দেমাতরাম্ই নয়, আরও কত বলে, রজনী সে বুঝিতে পারে না। রজনীর রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে। মন উত্তেজনায় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে।
>
> কিন্তু সহসা সে একদিন উপলব্ধি করিল, এই সমস্তের ফলে সর্বনাশ হইয়া গেছে তাহারই। ভাদ্র মাসে শারদীয় পূজার ডাকসাজ এবং আতসবাজির বায়না আনিতে রামনগরের বাবুদের বাড়িতে গিয়ে শুনিল, এবার বায়না হবে না, ডাকসাজ আতসবাজি দুইই বন্ধ।
>
> বাবু বলিলেন, ও বিলিতী রাংতা চুমকির কাজ চলবে না। আমরা খদ্দর দিয়ে প্রতিমা সাজাব। ও আতসবাজিও চলবে না। [৫]

রজনী পরবর্তীতে শোলা দিয়ে খদ্দর দিয়ে প্রতিমা সাজানোর বায়না নেয়। কিন্তু সঞ্চয় কিছুই তার ছিল না। তাই সে সেঙাত কালী সিং এর কাছে টাকা ধার করে। কিন্তু স্বভাবের দোষে সেই টাকাও নেশা

আর নারীর পিছনে খরচ করে ফেলে। যখন চেতনা হয় তখন টাকা সব শেষ। এরপর সে একটি শিশুর গলার হার চুরি করে টাকার যোগাড় করে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রজনী একদম বদলে যায়। যে রজনী সেঙাতিনী শ্যামা এবং রূপোপজীবিনী মেয়েদের শাড়ি দিত নিজে পছন্দ করে, সেই রজনী এখন শিশুদের জামাকাপড় নিয়ে ঘোরে। শ্যামা ভাবে তামাসা করছে রজনী। কিন্তু কাপড়ের বোচকা টান দিয়ে দেখে সব ছোট ছেলেমেয়েদের জামা। দেখে অবাক হয় শ্যামা, রজনী তাকে বলে :

> রজনী হাসিয়া বলিল, এবার থেকে মা-মণি খুকুমণিদের সাজাব মিতেনী ! তোমাদের তো সাজালাম অনেক দিন। বলিয়া সে বিচিত্রবর্ণের ঝলমলে ছোট ছোট জামাগুলি বহুমূল্য বস্তুর মত সযত্নে গুছাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। [৬]

রজনী মালাকারের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটেছে। একজন ব্যক্তি মালাকারের জীবনের প্রতিচ্ছবির মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্কর রাঢ় বাংলার লোকজীবনের মালাকার পেশীজীবী শ্রেণীর পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। 'প্রতিমা' গল্পে প্রতিমা গড়ার শিল্পী, তাদের কাজের প্রক্রিয়া, তাদের উপার্জনের মাধ্যম ইত্যাদির সঙ্গে তারাশঙ্কর পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

'ট্রিটি'

(শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৬)

'ট্রিটি' গল্পটিতে তারাশঙ্কর সমান্তরালভাবে বৈষ্ণব এবং শাক্ত সম্প্রদায়ের চিত্র তুলে ধরেছেন অনেকটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে। বীরভূম জেলায় বাউল, বোষ্টমদের পাশাপাশি শাক্ত সাধনার বিখ্যাত পীঠও রয়েছে। এই দুই শ্রেণীর ধর্মাচরণ এবং ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামি কালীচরণ আর রাধাচরণ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। জমিদার বাড়ির দুই শরিকের আশ্রয়ে শাক্ত আর বৈষ্ণব-নিষ্ঠ আচার পালন করতে লাগল কালীচরণ আর রাধাচরণ:

> পরস্পরের বাড়ি আট মাইল দূরবর্তী দুখানি গ্রামে। একজন কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শাক্তবংশের সন্তান। কালীচরণের আবক্ষ-লম্বিত দাড়ি, বড় বড় গোঁফ, বড় বড় চুল; কপালে সে একটার পয়সার মত আকারের সিঁদুরের ফোঁটা কাটে, গলায় ইয়া মোটা এক রুদ্রাক্ষের মালা পরে এবং মোটা গলায় মধ্যে মধ্যে ডাকেÍ কালী ! কালী ! সে

> ডাক শুনিলে মনে হয়, কালী কালীচরণের বদ্ধ কালা ঝি। পৈত্রিক ব্যবসায় গুরুগিরি, তাহার উপর ভাগ্যক্রমে জুটিয়াছে এই লাগ ফাঁসের ব্যবসায়।
>
> অপরজন-রাধাচরণ, বৈষ্ণবধর্মী ব্রাহ্মণবংশের সন্তান, উপাধি গঙ্গোপাধ্যায়। রাধাচরণ কিন্তু কেশধর্মী নয়, মুখে তাহার দাড়ি-গোঁফের চিহ্ন মাত্র নাই, মাথার চুল সে খুব ছোট করিয়া ছাঁটে, কেবল মধ্য-মস্তকে পরিপুষ্ট লম্বা টিকি পাদপহীন দেশের এরণ্ডের মত ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে থাকে। গলায় চার ফের মোটা তুলসীর মালা, কপালে নাকে তিলকমাটির ফোঁটা ও বুকে হাতে পদচিহ্নের ছাপে রাধাচরণ বিশোভিত। [৭]

ওপরে ওপরে দুজনেই ধর্মের আচার-নিষ্ঠা পালনে কঠোর কিন্তু বিশ্বাসে তারা ভণ্ড। তাদের ধর্ম পালনের অতিরঞ্জিত ব্যাপারটি তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছেন :

> গাজার কল্কের গোড়ায় গোলাপজলে ভিজানো ন্যাকড়া জড়াইতে জড়াইতে রাধাচরণ বলিল, আর ওই ঘৃনিত দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটা বন্ধ করারও প্রয়োজন বাবা। রাধা গোবিন্দ ও গন্ধ সহ্য করতে পারে না। বলিয়া চোঁ করিয়া টান মারিয়া কুম্ভক করিয়া দম চাপিয়া বসিয়া রহিল। তারপর 'ফু' করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া কল্কেটি শিষ্যের হাতে দিল, বলিল, সেই জন্যে প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল, প্রভু আমার যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে আছেন। সন্ধ্যায় তুমি প্রভুর মন্দিরে ত্বরিতানন্দ ভোগের ব্যবস্থা কর; খুব সুগন্ধি ষোড়শাঙ্গী ধূপের ব্যবস্থা কর, যেন ওই পদার্থটার গন্ধ প্রভুর কানে আর না যায়, মানে নাকে। [৮]

লেখকের গল্প-উপস্থাপনাগুণে পাঠকের মনে কৌতুক, কৌতূহল জেগেছে। গল্পের প্রথমদিকে তাদের ভণ্ডামি ধরা যায় না, তবে ধর্ম পালনের ঘটা দেখে কৌতূহল জাগ্রত হয়। দুজনের ভণ্ডামি ধরা পড়ে গল্পের এই জায়গাতে :

> রাধাচরণ ফিরিয়া দেখিল, দুই ঘরের দরজাতেই তালা ঝুলিতেছে। চাবির জন্য সেই খানটিতে হাত দিয়ে দেখিল, চাবি ঠিক আছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার একটা সঙ্কল্প মনে জাগিয়া উঠিল, উহাদের ঘরের চাবিও তো ওই ঘরের মাথাতেই আছে, ঘর খুলিয়া গামলাটা উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিলে কি হয় ! গাঁজা একটান টানিয়াই সে আসিয়াছিল, দ্বিধা বিশেষ হইল না তাহার। খানিকটা খুঁজিয়াই সে চাবি বাহির করিয়া ফেলিল। ঘর ঘুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া গন্ধে গন্ধে ঠিক গামলার কাছে হাজির হইল। বড় চমৎকার গন্ধ উঠিয়াছে কিন্তু ! গামলার কিনারায় হাত দিয়া কয়েক মুহূর্ত সে স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর এক টুকরা মাংস তুলিয়া মুখে দিল। আবার এক টুকরা, সে টুকরাটা বড়, তাহর পর পর গব করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বাধা পড়িল।

> তাহাদের ঘরে বোধ হয় ছেলেরা ফিরিয়াছে, শব্দ উঠিতেছে। হাতটা ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা গন্ধ পাইলে সর্বনাশ হইবে। দ্রুত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু সম্মুখেই লোক, সে আঁতকাইয়া বলিয়া উঠিল, কে?
>
> সে লোকটিও আঁতকাইয়া উঠিল, কে?
>
> রাধাচরণ দেখিল কালীচরণ, কালীচরণ দেখিল রাধাচরণ।
>
> রাধাচরণের হাতে মাংসের টুকরা, কালীচরণের হাতে মালপো। কয়েক মুহূর্ত পরে উভয়েই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর মাংসের গামলা, বোতল, গাঁজার কল্কে, মালপো লইয়া দুইজনেই বাহির হইয়া গেল। উভয়ে বলিল, মরুক বেটারা। অর্থাৎ উভয়েরই সহচরবৃন্দ। [৯]

কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। বিশ্বাসের চাইতে আচার পালনের অতিরঞ্জিত প্রথার প্রতি ঝোঁক রয়েছে রাধাচরণ আর কালীচরণের। তাদের মনের মধ্যে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস না থাকুক, কিন্তু লোক-দেখানো ধর্ম পালন তাদের করতেই হবে। রাঢ় বঙ্গের জনজীবনের সঙ্গে যেসব বৈষ্ণব আর শাক্ত ধর্মাবলম্বীরা রয়েছে তাদের জীবনযাপন, লোকাচার, ধর্মপালন-পদ্ধতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছেন কিছু ভণ্ড ধার্মিক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। তারা ভণ্ড হলেও ধর্মের জন্য যেসব আচার পালন করতে হয় সেগুলো ঠিকই করছে, কোথাও কোথাও অতিরিক্ত মাত্রায় করছে। আর এভাবেই লেখক পাঠককে রাঢ় বঙ্গের লোকায়ত জীবনের ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

বেদেনী
(শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৪৬)

পরিচিত সমাজপরিমণ্ডলের বাইরে অবস্থিত বেদে সমাজকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর 'বেদেনী' গল্পে। রাঢ় বাংলার প্রথাগত সামাজিক গোষ্ঠীর থেকে স্বতন্ত্র এই বেদে জাত। আধা মুসলমান আধা হিন্দু এই গোষ্ঠীর বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক নিজের কল্পনার রংও মিশিয়েছেন। রাধিকা তাঁর এই কল্পনার সৃষ্টি। বেদে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। তারাশঙ্কর এখানে সার্কাস, বাজি দেখায় এরকম বেদে গোষ্ঠী তুলে এনেছেন। আমাদের চেনা জগতের বাইরে বেদেদের লাগামছাড়া জীবনকে রূপায়িত করেছেন সূক্ষ্মভাবে। গল্পের শুরুতেই লেখক এই পেশার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা কঙ্কালীর এস্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে 'ভোজবাজি–ছারকাছ'। ছোট তাঁবুটার প্রবেশ পথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে। 'ভোজবাজি-সার্কাস'। লেখাটার একপাশে একটা বাঘের ছবি, অপর দিকে একটা মানুষ, তাহার এক হাতে রক্তাক্ত তরবারী, অপর হাতে একটি ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশ মূল্য মাত্র দুইটি পয়সা। ভিতরে আছে কিন্তু 'গোলকধামে'র খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীর বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্যে দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ', 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়' 'তাজ বিবিকা কবর'। তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বনেশে একটা পর্দা ঠেলিয়া দিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ। বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া তাহার সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাঘের চুমা খায়, সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটি পুরিয়া দেয়, মনে হয়, মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়, সর্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাক পিটিতে থাকেÍ দুম-দুম, দুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী প্রকাণ্ড একজোড়া করতাল বাজায় ঝন-ঝন-ঝন। [১০]

সভ্য মানুষের ধারণায় বেদেদের জীবনযাপন অস্বাভাবিক, বর্বর। গল্পের ঘটনায়ও সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। শম্ভু বেদের স্ত্রী রাধিকা বেদেনী উন্মত্ত যৌবনের তাড়নায় শম্ভুর তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কিষ্টো বেদের সঙ্গে পালিয়ে যায়। প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে এই খাপছাড়া জীবন মেলানো যায় না। তবুও এই গল্প তারাশঙ্করের অসাধারণ শিল্পকর্মের উদাহরণ।

ডাইনী

(প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৭)

'ডাইনীর বাঁশী' গল্পে যেমন অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার মেয়েটিকে ডাইনী ভাবতে বাধ্য করেছিল 'ডাইনী' নামের গল্পেও তেমনটি দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে দেবলীনা শেঠ 'তারাশঙ্করের ডাইনীরা' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের কিম্বা তারাশঙ্করের ছেলেবেলাকে ব্যক্তিক চালচিত্রের বাইরে এনে বলা যায়, সে ছিল এক সমষ্টিগত শৈশব, যখন মানুষের মনে যুক্তি বিশ্লেষণের তুলনায় সরল প্রত্মবিশ্বাসের অনুশাসন ছিল প্রবলতর। ভূত-পেত্নী, ডাইনী-ডাকিনী তাই ছিল সেদিন মানুষেরই 'মনের আনাচে কানাচে'। সরল সেই অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের স্থায়ীভাব ছিল ভয়। স্থায়ী ভাবÍ অর্থাৎ সর্বদেশ সর্বকালগত চিত্তে বিরাজমান সেই ভাব। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, তারাশঙ্করের কথায়Í 'একালের ছেলেরা' তো ভয় পায় না ভূত ডাইনীর গল্পে। [১১]

একজন বৃদ্ধা যাকে গ্রামবাসী ডাইনী বলে স্বীকার করে নিয়েছে তারই দীর্ঘশ্বাস রয়েছে সম্পূর্ণ গল্প জুড়ে। লোকের বিশ্বাস আর আশে পাশে ঘটতে থাকা দুর্ঘটনাগুলো কাকতালীয়ভাবে মিলে গেলে বৃদ্ধাও নিজেকে ডাইনী ভাবতে শুরু করে। তারাশঙ্কর তার মনোভূমি উন্মোচন করেছেন :

> আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া উঠে ! বহুকালের পুরানো একখানি আয়নাÍ সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজের ভয় হয়Í ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মত ঝকমকে ধার ! জরা-কুঞ্চিত মুখ, শণের মত সাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানার চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কি সুন্দর লালচে রঙ, আর কি পালিশই না ছিল ! আর আয়নার কাচখানা ছিল রোদ চক্‌চকে পুকুরের জলের মত। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত ! ছোট কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে; কপালের নীচেই টিকালো নাকÍ চোখ দুইটি ছোটই ছিলÍ চোখের তারা দুটিও খয়রা রঙেরই ছিলÍ লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় করিত, কিন্তু তাহার বড় ভাল লাগিত; ছোট চোখ দুটি আরও একটু ছোট করিয়া তাকাইলে মনে হইত আকাশের কোল পর্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায় ! অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিলÍ নরুণ দিয়ে চেরা, ছুরির মত চোখে বিড়ালীর মত এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভাল লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না। কোথা দিয়া যে কি হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না; তবে হইয়া যায়। [১২]

ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্ঘটনার কারণ প্রচ্ছন্নভাবে বা সচেতনভাবে লেখক পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টাও করেন নি। গ্রামের লোকের বিশ্বাসের জায়গাটিই এখানে উঠে এসেছে। দেবলীনা শেঠ বলেছেন :

> তারাশঙ্করের যখন লক্ষ করেন সুরধুরনীর 'চোখের পিঙ্গল তারা এবং সেই ছোট চোখ 'নরুন দিয়ে চেরা'Í ঐ পিঙ্গলবর্ণ নিয়ে আসে ক্ষয়ের আভাস, যে ক্ষয় দেখেছি আমরা ছাতিফাটার মাঠে। শুধু তাই নয়, 'একটু লালচে আভা ছিল তারা চুলে'। স্পষ্টতঃই ভারতীয় সামুদ্রিক বিদ্যার অর্ন্তগত বিষকন্যা বর্ণনার তির্যক আভাস মেলে। নরুন চেরা চোখে তার চিলের মত দৃষ্টি ছুরির মত ঝক্‌ঝকে ধার; মনের মত চুল আর জরাকুঞ্চিত দন্তহিন মুখ। মোটকথা ডাইনীর দেহরূপের একটি সিদ্ধরসাত্মক আভাস মেলে। এরই সঙ্গে হয়তো তুলনা করা যাবে য়ুরোপীয় ডাকিনীর : æIn Folk-lore witches are invariably described as being old, ugly and living alone... The witches could be identified by pigment spots on their bodies".
> আসলে পুবে কিংবা পশ্চিমে, ডাইনীদের বোধকরি এমনটাই হতে হয়। তারাশঙ্করের নিজের চোখে দেখা 'স্বনা ডান'ও তো সুরধুনীরই দোসর শুকনো কাঠির মত। [১৩]

সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে ডাইনী হিসেবে পরিচিত বৃদ্ধার নিজের বিশ্বাস। লৌকিক জীবনের চিত্র রূপায়িত করতে গিয়ে লেখক জীবনের নানা বিশ্বাস, মূল্যবোধ এসবের ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অপবিশ্বাস, কুসংস্কার, সংস্কারÍ এসবই নিয়েই জীবন। লোকজীবনের চিত্র শুধুমাত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতা নয়, বরং ভিন্নতর জীবন বা ভিন্ন মূল্যবোধ বা গতানুগতিক ধারার বাইরের জীবনপদ্ধতি ও জীবনযাত্রার অংশ।

রাঙাদিদি

(ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৪৭)

পটুয়াদের জীবনের ওপরে আলোকপাত করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাঙাদিদি' গল্পে। বিচিত্র জীবনের গল্প এটি। পটুয়াদের জীবনাচরণ লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> পটুয়ারা ধর্মে ইসলামীয়, কিন্তু আচারে ব্যবহারে নামে পুরা হিন্দু। তাহারা নামাজও পড়ে, আবার হিন্দু ব্রত আচারও পালন করে, হিন্দুর অখাদ্যও খায় না। দেব-দেবীর প্রতিমা গড়ে, পটের উপর হিন্দুর পুরাণ-কথার ছবি আঁকে; সেই পট দেখাইয়া লীলা-গান করিয়া ভিক্ষা করে। জাতি জিজ্ঞাসা করলে বলে, ইসলাম। চাষাবাসের বালাই নাই ; ভিটা, চলিবার পথ, গৃহস্থের দুয়ার– এ তিন ছাড়া মাটির সহিত সম্বন্ধ নাই । সেই বলিয়াই সরস্বতীর মত মেয়েরও তাহাদের সমাজে সাজা নাই, কিন্তু তাহাদের

> রসনা তো মানুষেরই রসনাÍ সুতরাং নিন্দা না থাকিয়া পারে না; সরস্বতীর নিন্দায় পটুয়া পাড়া ভরিয়া উঠিল। [১৪]

বৃদ্ধ গণপতি পটুয়ার তরুণী স্ত্রী হচ্ছে সরস্বতী। সরস্বতী দেখতে সুন্দরী তাই পাড়ার সব পুরুষের নজরে পড়ে। সরস্বতীর বাবা-মা টাকার বিনিময়ে সরস্বতীকে বুড়োর কাছে বিয়ে দিয়েছিল। তৎকালীন গ্রাম্য সমাজব্যবস্থায় দরিদ্র লোকেরা অর্থের বিনিময়ে ধনীলোকের কাছে মেয়ের বিয়ে দিত। সমাজে এটা নিয়ে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হত না, সবাই এটাকে স্বাভাবিক হিসেবেই বিবেচনা করত। পাড়ার বিবাহিত পুরুষরাও সরস্বতীকে পেতে চায়। গণপতি পটুয়া বৃদ্ধ বলে সরস্বতীর প্রতি তাদের এই মনোভাব। সরস্বতীর জীবনের চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি লেখক পটুয়া মেয়েদের কাজকর্মও তুলে ধরেছেন :

> আরও একটি ব্যবসা আছে পটুয়া মেয়েদের। ভদ্র গৃহস্থ বাড়ির মধ্যে ডাক পড়ে, পুরানো কাপড়ে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তুলিবার জন্য। ছোট-বড় তিন চার রকমের সূচ হাতে করিয়া তাহারা গৃহস্থের বাড়িতে যায়, গৃহস্থ কাপড় দেয়, বস্তা দেয়Í তাহারা ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তোলে ঠিক যেন যন্ত্রের মত। নক্সাগুলিও তাহাদের মুখস্থ। লতাপাতা, পাখি, ফুল, খেজুর ছড়ি, বরফি কাটা, বৃন্দাবনী, জলতরঙ্গ প্রভৃতি ছক তাহারা চোখ বুজিয়া তুলিতে পারে। পাঁচ বছরের পটুয়ার মেয়ে মা-ঠাকুরমার কাছে উঠানে বসিয়া ধূলার উপর আঙুল দিয়া নক্সা আঁকিতে শেখে, মুখস্থ করে। [১৫]

বৃদ্ধ গণপতি সরস্বতীকে ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসার ধরনটি অন্যরকম। সরস্বতী তাকে নিয়ে মজা করত, সেটাও তার ভাল লাগত। আবার বুড়োর মৃত্যুর পর সরস্বতীর দুয়ারে অনেক যুবকই এসেছিল। কিন্তু সরস্বতী তাদের কারও গলায় মালা দেয়নি। সে তার বাকি জীবন একাই কাটিয়েছে পুরানো পেশাকে অবলম্বন করে। বিচিত্র মানবমনের পরিচয় দিয়েছেন লেখক, জীবনের গল্প সবসময় সূত্র মেনে চলে না।

পিঞ্জর

(চতুরঙ্গ, আশ্বিন ১৩৪৭)

বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবনচিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ফুটে উঠেছে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে, অবলীলায়। 'পিঞ্জর'-ও এরকম একটি ছোটগল্প। বাজিকর গোষ্ঠীর জীবন এই গল্পে

প্রকাশ পেয়েছে। নররাক্ষস একজন মানুষ এবং সে কাঁচা মাংস খায়Í সেরকম লোকের জীবনও এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাজিকর দলের নতুন জায়গায় আস্তানা গড়ার চিত্রটা এরকম :

> টিনের নিরাপদ আচ্ছাদনের নীচে, চারিদিকে তাঁবুর কানাৎ খাটাইয়া তাহারই মধ্যে তাহারা আসর ও আস্তানা পাতিয়া বসিল। কানাতের পরিবেষ্টনীর মধ্যে এক প্রান্তে ছোট একটি কাপড়ের কুঠরী বানাইয়া তাহার মধ্যে আস্তানা গাড়িলÍ পশ্চিম দেশীয় প্রৌঢ়। সেই প্রান্তের আর এক পাশে একটি ঘর করিয়া তাহার মধ্যে নীড় বাঁধিল– পাহাড়িনী, তাহার সঙ্গে দুইটা খাঁচায় তিনটা বাঘ। গুর্খাটা থাকে সর্বত্র– যে দিন যেখানেÍ আচ্ছাদনতলের যে কোন স্থানে ধূলার উপর পড়িয়া থাকে।
>
> ওই লোকটাই নররাক্ষস। একটা কাপড়ের আবরণ সরাইয়া দিলে দেখা যায়– একটি খুঁটির সঙ্গে আবদ্ধ কোমরে বাঁধা পাহাড়ীটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে। কোমরে একটি সামান্য কৌপীন ছাড়া আর কিছু নাই, পাথরের মত কঠিন পেশীবহুল উলঙ্গ পীতাভ দেহ, মাথার দীর্ঘ পিঙ্গলাভ চুলের আবরণে আবৃত মুখÍ সে মূর্তি ভয়ঙ্কর। তাহার উপর সম্মুখে থাকে একটা প্রকাণ্ড ধূপদানি; তাহা হইতে উঠিতে থাকে ধূসর যবনিকার মত ধোঁয়ার পুঞ্জ। লোকটা বিকট চিৎকার করেÍ হাঁই–হাঁইÍ হিংস্র ক্ষুধার্তের মত। তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দেয়Í পায়ে ও পাখায় বাঁধা হাঁস অথবা মুর্গীÍ লোকটা টপ করিয়া লুফিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই গলায় দাঁত বসাইয়া কণ্ঠনালীটা ছিঁড়িয়া দেয়– ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হয়; সে রক্তে সে আপনার পীতাভ মুখ ও শরীর রক্তাক্ত করিয়া ভীষণ-দর্শন হইয়া উঠে। তারপর সে ভীষণ গ্রাসে আরও দুই চারিটা কামড় দেয়Í হাতে টানিয়া টানিয়া পালকগুলি ছড়াইয়া দেয়, শেষে অভিভূত দর্শকের বিহ্বলতার সুযোগ লইয়া দড়িটা ছিঁড়িবার অভিনয় করে, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়িনী পর্দাটা টানিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া দেয়। ইহার সবটা তাহার অভিনয় নয়; প্রচুর সস্তা মদ খাইয়া সত্যই সে তখন অধ-উন্মত্ত ; রাক্ষসের মত বন্য। [১৬]

এভাবেই জীবন চলতে থাকে বাজিকরদের। আদর্শ-নীতি-মূল্যবোধ-সংযম এসব এদের ধারণার বাইরে। বন্য-হিংস্র স্বভাববৈশিষ্ট্য থেকে এরা বেরুতে পারে না। এই অসভ্যতার পিঞ্জরে এরা আটকে থাকে। বাঘটিকে দিয়ে লেখক প্রতীকীভাবে এটা তুলে ধরেছেন। প্রতীকী এই অর্থে যে অনেকদিনের অভ্যস্ত জীবন সেটা যত শৃঙ্খলিত হোক না কেন সেটা থেকে সে বের হতে পারে না, অথবা বের হয়ে যেতে পারলেও অনভ্যস্ত জীবনে খাপ খাওয়াতে পারে না। এছাড়াও নররাক্ষসের প্রাণধারণের ক্ষুধার পাশাপাশি শারীরিক চাহিদারও বিকৃত প্রকাশ ঘটেছে। পাহাড়িনী আর প্রৌঢ় ম্যাজিশিয়ান নররাক্ষসের

ভেতরে উদগ্র কামনাকে জাগিয়ে তোলে। যার ফলে ঘটে যায় দুটি মৃত্যু। এভাবেই এ গল্পে একটি বিশেষ শ্রেণীর জীবন রূপায়িত হয়েছে।

চোর

(ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৪৭)

'চোর' গল্পটিতে তারাশঙ্কর চোরপল্লীর একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শমী ডোম। ডোমেরা বংশানুক্রমিকভাবে চুরি করে। দিনের বেলা পেয়াদাগিরি, রাখালি, মাহিন্দারি, জনমজুরি করলেও ডোমদের জাত-ব্যবসা ছিল চৌর্যবৃত্তি। চোর না হলে নিজেদের সমাজে সম্মানহানি ঘটত। বারকয়েক জেল না খাটলে ডোমদের পক্ষে ব্যাপারটা হয় মর্যাদাহানিকর। শশী ডোম চোরদের নেতা। ডোমরা দলবদ্ধভাবে জেলে গেলে অভাব দেখা দেয়। তখন শশী ডোমদের বৃত্তি সংস্কারের চেষ্টা করেছিল। গল্পে শশীর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়:

> নাÍ আর চুরি নয়, চুরি আর সে কাহাকেও করিতে দিবে না। হাত দুইটা সঞ্চালন করিয়া সে দেখিলÍ সে পারিবে, ডোম-কাটারি লইয়া বাঁশের তালপাতার কাজ সে বেশ করিতে পারিবে। মেয়েগুলা তালপাতার চাটাই বুনিবে, পাতার শির দিয়া ঝাঁটা বাঁধিবে, বাঁশের ছিলকা দিয়া পাখা, ডালা, কুলা, সাজি তৈয়ারী করিবেÍ সে নিজে মোড়া তৈয়ারী করিবে, খল্‌পা বুনিবে। এছাড়া আর উপায় নাইÍ যুবতী কন্যা বধূগুলি অভাবের অজুহাতে উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে বাঁধ-ভাঙ্গা জলের মত অধীর মুক্তি দিয়া যাহা করিয়া বসিবে সে কল্পনা করিয়া রুগ্‌ণ শশীর শীতল রক্ত যেন জমিয়া যাইবার উপক্রম করিল। [১৭]

কিন্তু বংশানুক্রমিকভাবে যে কাজে অভ্যস্ত, সে কাজকে সহজে ছাড়তে পারে না ডোম গোষ্ঠী। পুরুষেরা জেলে গেলে নারীদের মধ্যে ঘর ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। শশী ডোম বাতব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে গেলে তার আর জেল হয় না কিন্তু একসময় সে চলাফেরা করার শক্তি ফিরে পায়। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে রাতে বাসন চুরি করে আর দিনে পঙ্গু সেজে অসুস্থ হওয়ার ভান করে। অবশেষে সে গৃহস্থ বাড়িতে ভাত খেতে গেলে সেই বাড়ির বিধবা শ্যামাঠাকরুনের ওপর মায়া হয়। দরিদ্র বিধবার মেয়ের সদ্যোজাত সন্তানের টাকার অভাবে আঁতুর-বিদায় সম্ভব হবে না শুনে শশী তিনটি টাকা রেখে আসতে চায় :

> সে আসিয়া ঠাকরুনের বাড়িতে ঢুকিয়া তিনটা টাকা ট্যাঁক হইতে বাহির করিয়া দাওয়ার উপর রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সহসা তাহার মনে হইল– ওই 'এগুনি'টা যদি প্রথমে উঠে তবে তো ওই মারিয়া দিবে। সে টাকা তিনটি কুড়াইয়া লইল; সেই মুহূর্তেই মনে হইল তিন-তিনটা টাকা ! না ! হইতেই পারে না। মরুক, ঠাকরুন মরুক। কিন্তু তাহাতেও মনটা কেমন করিতেছে। সহসা অন্যমনস্ক শশীর শিথিল হাত হইতে একটা টাকা ঠং করিয়া দাওয়ার উপর পড়িয়া গেল। [১৮]

এই গল্পে গল্পকার শশী ডোমের মানবিক দিক তুলে ধরেছেন। বংশগতভাবে তাদের রক্তে যে চৌর্য-বৃত্তির ধারা প্রবাহিত হয়েছে সেই ধারার বিপরীত একটি ধারা এই শশী চোরের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'চোরের মা' নামে অপর একটি গল্পের মধ্যেও তারাশঙ্কর এই চোর সম্প্রদায়ের একজনকে উপস্থাপন করেছেন যে বংশগত-চৌর্যবৃত্তি রক্ষা করতে গিয়ে পিটুনীতে মারা যায়।

কবি

(প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৭)

তারাশঙ্করের 'কবি' গল্পটিকে তাঁর 'কবি' উপন্যাসের বীজ বলা যায়। এই গল্পে হাড়ি বংশের একটি ছেলে নিতাই-এর কবি হয়ে ওঠার কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে। কবিয়াল হয়েছে বলে চুরি-ডাকাতিতে তার গভীর অনাস্থা। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মনেও যে সুকুমার বৃত্তি থাকতে পারে নিতাই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নিতাই বংশানুক্রমিকভাবে পাওয়া খারাপ স্বভাব থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে :

> সে চুরি করে না, মিথ্যা বলে না। এই সংযম তাহার ভীষণ উগ্র। এই উগ্রতার জন্যই নিতাই আত্মীয়-স্বজন সকল জন হইতে বিচ্ছিন্ন। [১৯]

নিতাইয়ের মামা গৌর হাড়ি এই অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত, মাতামহ ছিল ডাকাত, প্রমাতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিতাইয়ের বাবা সিঁদেল চোর, পিতামহ ছিল ডাকাত, মাতামহের সঙ্গে একসঙ্গে ডাকাতি করত। এরকম একটি বংশে জন্মে নিতাই নিজের স্বভাবের গুণে চুরি-ডাকাতি-লুণ্ঠন-হত্যাÍ এসব খারাপ বৃত্তি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে। বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বংশের নির্ধারিত পেশা থেকে সে দূরে থাকতে পেরেছে। কবিগানের লড়াই করার আগে সে কুলিগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। কিন্তু কবিয়াল হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পর সেই কুলিগিরিও আর করতে চাইল না। নিতাইয়ের কাছে নেশা বলতে বোঝায় চা আর এক পোয়া দুধ, এ দুটি তার না হলে চলে না। এই দুধ তাকে

দিয়ে যায় অন্য গ্রামের মুচি সম্প্রদায়ের একটি মেয়ে, নিতাই তাকে ঠাকুরঝি বলে সম্বোধন করে। এই ঠাকুরঝির প্রেমে পড়ে যায় নিতাই। কিন্তু ঠাকুরঝি বিবাহিতা, স্বামী-সংসার সবই তার আছে। পরে ঠাকুরঝির স্বামী তাকে ত্যাগ করলে রাজার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর নিতাই উদ্দেশ্যহীনভাবে স্টেশনে চলে যায়। এখানেই গল্প শেষ হয়ে যায়। গল্পের মধ্যে নিতাইয়ের জাত নিচু হওয়ার কারণে মহাদেব কবিয়াল নিতাইকে অপমান করে। অপমানিত নিতাই নিজেই দল করার সিদ্ধান্ত নেয়। নিতাই কবিয়ালের স্বরচিত দুটি কলি অসাধারণ :

> কাল যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।
> কালো চুলে রাঙা কোসোম (কুসুম) হের হের নয়ন কোণে ! [২০]

একরাত্রি
(শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৪৭)

'একরাত্রি' গল্পের পটভূমি একটি শাক্ত মন্দির। মন্দিরের বর্ণনায় তারাশঙ্কর ভিন্ন একটি আবহ তৈরি করেছেন। গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে ঘন বনের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরটির অবস্থান। কালো রঙের মন্দিরটিকে দেখলে মনে হয় ছোট পাহাড় থেকে খোদাই করে গড়া হয়েছে। মন্দিরের সামনে একটি জীর্ণ নাটমন্দির রয়েছে। এই নাটমন্দিরের দুই পাশে দু'টি মাটির ঘরÍ একটি ভোগ মন্দির, অন্যটিতে সন্ন্যাসী বা সাধক কেউ আসলে থাকতে দেওয়া হয়। এরকম একটি মন্দিরের ভয়াল একটি রূপও তারাশঙ্করের বর্ণনায় পাই:

> তান্ত্রিক সাধনার বহুবিখ্যাত সিদ্ধপীঠ। এককালে নাকি নরবলি হইত ; এখন পশুবলি হয়Í ছাগল, ভেড়া, মহিষ; এক এক বিশিষ্ট পর্বে শতাধিক পশুর রক্তে নাটমন্দিরের চত্বর ভাসিয়া যায় এবং দেবীমন্দিরের দুয়ারের সম্মুখে পশুমুণ্ডের স্তূপ গড়িয়া উঠে। মন্দিরের ডান দিকে ভৈরবতলাÍ প্রাচীন একটি শিমুল গাছের তলায় একটি শিবলিঙ্গ। মন্দিরের বাঁ দিকে সিন্দূরলিপ্ত কতকগুলা নরকপাল। রাত্রে দেবী নাকি মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভৈরবের সহিত ঐ নরকপাল লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়া থাকেন। নিত্য প্রভাতে দেখা যায়, নরকপালগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; পুরোহিত নিত্য সেগুলিকে গুছাইয়া রাখে। দেবীর খল খল হাসিতে, ভৈরবের হুম হুম ধ্বনিতে, কৌতুকোচ্ছল দর্শক শিবা, পেচক, শকুনের আনন্দধ্বনিতে আশেপাশের পল্লীর অধিবাসীরা সুষুপ্তির মধ্যেও শিহরিয়া উঠে, গাছে গাছে পাতাগুলি মৃদু কম্পনে থর থর করিয়া কাঁপে। রাত্রে এ দেবস্থলে কেহ বড় থাকে

> না। প্রাচীনকাল হইতে ভূমি-বৃত্তিভোগী পুরোহিত সকালে আসিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিয়া সন্ধ্যারতি শেষ করিয়াই গ্রামে আপন গৃহে চলিয়া যায়। তাহার পর হইতেই আরম্ভ হয় দেবলীলা। কখনও কখনও দুই-দশজন অসমসাহসী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী থাকিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু দুই-একজন ছাড়া কেহ থাকিতে পারে নাই। বাকি সকলে অর্ধরাত্রেই পলাইয়া গিয়াছে, দুই-একজন পাগল পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। [২১]

অস্থায়ী মানব জীবনে স্নেহ-ভালবাসা-মায়া সবই ক্ষণস্থায়ীÍ এরকম একটি বোধ গল্প শুরু করার পশ্চাতে লেখকের মনে সম্ভবত ক্রিয়াশীল ছিল। দু'জন সন্ন্যাসীর আলাপচারিতার মাধ্যমে তারাশঙ্কর পাঠকের সামনে রূপলাল এবং কার্তিক নামে পিতা-পুত্রের গল্প উপস্থাপন করেছেন। নিবিড় জঙ্গলের নির্জন মন্দিরের পটভূমিতে সন্ন্যাসীদ্বয় গল্পের মধ্য দিয়ে নিজেদের কথাই বলেছে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী জানে না যে তরুণ সন্ন্যাসী তার ছেলে কার্তিক, আবার তরুণ সন্ন্যাসীও জানে না যে এই প্রৌঢ় সন্ন্যাসী তার বাবা রূপলাল। একটি রাতে তাদের কথোপকথনে পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদের গল্প উঠে এসেছে। সন্ন্যাসী দু'জন জানে না যে তারা পরস্পরকে খুঁজছে কিন্তু পাঠকের সামনে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ভাববিনিময়ের একপর্যায়ে যখন দুটি হৃদয়ের স্নেহার্দ সম্পর্ক ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তখন এই স্নেহ-ভালবাসার বিপরীত অনুভূতি প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সঞ্চার করে লেখক সুনিপুণ শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন :

> অকস্মাৎ শৃগালের সমবেত উচ্চধ্বনিতে পেঁচার দীর্ঘ কর্কশ রবে বনভূমি মুখর চকিত হইয়া উঠিল, বাসায় বাসায় পক্ষ বিধূনন ও দলে দলে উড়ন্ত বাদুড়ের পাখার শব্দে নিশীথিনী যেন উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। [২২]

যাদুকরী

(আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৪৮)

বেদে, পটুয়া, বাজিকর, যাদুকরÍ এসব সম্প্রদায় সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ। প্রথাগত মূল্যবোধ দিয়ে বিচার করলে এসব গোষ্ঠীর জীবনাচরণ সাধারণ মানুষের কাছে অসভ্য বা বিকৃত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় বাংলার লোকজীবন যখন তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে তুলে এনেছেন তখন নৈতিকতার মানদণ্ডে এসব ব্রাত্য মানুষকে উপেক্ষা করেননি। ভাল-মন্দ যাচাই করার প্রয়োজনও অনুভব করেননি। শুধু তাদের জীবনকে শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবং কল্পনার রঙে

বাস্তবতাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন। 'যাদুকরী' গল্পটিতে এরকমই এক গোষ্ঠীকে দেখা যাবে। বাজিকর অথবা যাদুকরÍ ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়াও এদের সংস্কৃতি এবং জীবনধারণের উপায় সম্পর্কে লেখক নিখুঁত তথ্য দিয়েছেন :

> বাজীকর একটি বিচিত্র জাতি। বাংলাদেশে অন্য কোথাও আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। বীরভূমের সীথল গ্রামে এবং আশেপাশেই ইহাদের বসতি। বেদে নয় তবু যাযাবরত্বে বেদেদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ধর্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জাতি বা সম্প্রদায় জাতিকুল পঞ্জিকা ঘাটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। পুরুষেরা ঢোলক লইয়া গান করে, যাদুবিদ্যার বাজী দেখায়। নিরীহ শান্ত প্রকৃতি, গলায় তুলসীর মালা, পরণে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা। ঐ ভাষা হইতেই লোকে চিনিয়া লয় ইহারা বাজীকর। মেয়েরা কিন্তু পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। কেশে বেশে বিন্যাস তাহাদের অহরহ, রাত্রে শুইবার সময়ও একবার কেশ বিন্যাস করিয়া লয়, প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই বসে চুল বাঁধিতে। পরণে সৌখীন–পাড় শাড়ী, হাতে এক হাত করিয়া কাচের রেশমী অথবা গিল্‌টির চুড়ি, গলায় গিল্‌টির হার, উপর হাতে তাগা অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী মাকড়ী, এখন পরে গিল্‌টির ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশনের কর্ণভূষা। কাঁকালে একটা গোবরমাটিতে লেপন দেওয়া বিচিত্র গঠন ঝুড়ি, তাহার মধ্যে থাকে সাপের ঝাঁপি, বাজীর ঝোলা, ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র; সেগুলিকে ঢাকিয়া থাকে ভিক্ষায় সংগৃহীত পুরানো কাপড়। মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান, নিজেদের বিশিষ্ট সুর, নাচও তাইÍ বাজীকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে না। লোকে বলে তামার বদলে রূপো দিলে নির্বিকারচিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজীকরের মেয়ে। দর্শকে চোখ নামায়, কিন্তু বাজীকরের মেয়ের চোখের অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পলক পড়ে না; দুনিয়ার লোকে ছি ছি করে কিন্তু বাজীকরের সমাজে ইহার নিন্দা নাই, বাজীকরের মনের ছন্দ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য অস্বছন্দ হইয়া উঠে না। [২৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপধ্যায় এভাবে বাজিকর শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে গল্পটি শুরু করেছেন। কিন্তু গল্পের নাম থেকে বোঝা যায় যে এটি বাজিকর শ্রেণীর এক মেয়ের বিচিত্র কাহিনী। একটি দম্পতির মাঝে

ভুল বোঝাবুঝি দূর করে বিচ্ছেদ ঠেকানো, একটি পালিয়ে আসা চোরকে বিপদ থেকে মুক্ত করা এসবের সঙ্গে তার নগ্ন দেহে নৃত্যÍ এগুলো মেলানো যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো এক যাদুবলে একই মেয়ের দ্বারা এসব সম্ভব হয়েছে। গল্পকার এইজন্যই বোধহয় গল্পের নাম দিয়েছেন 'যাদুকরী'। নীতি বিবেচনা করা যাদের স্বভাবে নাই তারাই পারে সবরকম কাজ করতে। একটি টাকার বিনিময়ে বাজিকরী নাচে :

> মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া। এতটুকু সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষ দৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না । কণ্ঠে মৃদুস্বরে সঙ্গীত -
>
> হায়রে মরি গলায় দড়ি
> তুমি হরি লাজ দিবা
> হায়রে মরি গলায় দড়ি
> তুমি হরি লাজ দিবা
> তুমার লাজেই আমি মরি
> নইলে আমার লাজ কিবা
> কুল ত্যাজিলাম মন সঁপিলাম
> কলঙ্কেরই কাজল নিলাম–
> হায়রে মরি বস্ত্র নিয়া
> তুমি আমায় লাজ দিবা !
> উর-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনাÍ; [২৪]

গল্পের শেষে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাজিকরীর আরেকটি সম্ভাব্য পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের যে তথ্যটি তিনি পাঠককে দিয়েছেন তা হল :

> রাঢ়ের সিদ্ধলরাজ ভবদেব ভট্টÍ গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ–উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে দেশান্তরে সংবাদ গ্রহণ করিয়া আনিত। তৎকালীন অন্যান্য রাজারাও এই দৃষ্টান্তে–[২৫]

এভাবে তারাশঙ্কর একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন শুধু, স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করে দেননি। বাজিকর ছাড়াও ডোমপাড়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন লেখক, তা হলোÍ "ডোমপল্লীÍ এ অঞ্চলের বিখ্যাত চোর-ডাকাতের পল্লী। পল্লীর প্রত্যেক মানুষটির রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অসংখ্য কোটি চৌর্য-প্রবণতার বীজাণু যেন কিলবিল করে। " [২৬] এভাবেই বিচিত্র লোকজীবনের রূপায়ণ ঘটেছে এই গল্পে।

'পৌষ-লক্ষ্মী'

(যুগান্তর, শারদীয়া ১৩৫১)

'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পটিতে রয়েছে রাঢ় বাংলার কৃষকসমাজের ঘরের চিত্র, ক্ষেতের চিত্র। তারাশঙ্কর এরকম গল্প আরও লিখেছেন, যেমন 'কালাপাহাড়'। তবে 'কালাপাহাড়' গল্পে কৃষি জীবনের চাইতে গুরুত্ব পেয়েছে কালাপাহাড় নামের মহিষটি। 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পেও প্রাণী আছে তবে ধান আর ধানের ক্ষেত্র বিশাল জায়গা জুড়ে দৃশ্যমান। গ্রামজীবনের একটা চিত্র গল্পকার প্রথমেই পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন :

> পূর্বদিকে নদীর ধার পর্যন্ত গাঁয়ের মাঠ, তিন ভাগে ভাগ করা, নইলে মাঠ একটাই। গ্রামের কোল থেকে নদীর ধার পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। গোটা মাঠখানি এবার ধানে থইথই করছে, সোনার বরন রঙ ধ'রে এসেছে। ওই ধানই জীয়নকাঠি, মরণকাঠি; এবারের ধান ঘরে উঠলে জীবন থাকবে নইলে মরণÍ অবধারিত মরণ, তাতে আর কারও কোন সন্দেহ নাই। ভরসার মধ্যে বাগ্‌দী-কাহার-মুচিরা যারা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তারা যদি ফিরে আসে। আর যদি আসে দুমকা থেকে সাঁওতালের দল।
>
> গাঁয়ের বাগ্‌দী-কাহার-মুচি এদের যারা দিনমজুরি খাটে, চাষ করে না, তারা প্রতি বছরই বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চলে যায়। বিশেষ করে অজন্মা আকঁড়া হলে সেবার দল বেঁধে চলে যায়, অজন্মা না হলেও দু–ঘর এক–ঘর যায়, আবার ফেরে এই ধান কাটার সময়। কেউ কেউ সেই বছরই ফেরে; কেউ কেউ ফেরে পাঁচ বছর পর, কেউ বা ফেরে এক পুরুষ পর। [২৭]

মুকুন্দ পাল বৃদ্ধ কৃষক। লোকের অভাবে সে নিজেই ক্ষেতের ধান কাটতে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে কাজ যেন আগায় না। বৃদ্ধের মনে পড়ে তার যৌবনের কথা। কত দ্রুততার সঙ্গে সে কৃষিকাজ করত। অতীতের এসব ঘটনা তার কাছে এখন কাহিনী মনে হয়। তার স্মৃতিচারণায় তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা উঠে

এসেছে। শরীরে শক্তি বৃদ্ধির জন্য সে মদ্যপান শুরু করে। অসুস্থ শরীরে ফসল তুলতে না পারার ব্যর্থতা তাকে মদ্যপানে উদ্বুদ্ধ করেছে। ক্ষেতে ফসল ফলিয়েও ফসল ঘরে তুলতে না পারার অক্ষমতা তাকে পাগল করে ফেলে। মদ্যপানের ফলে শক্তি পেয়েছে সে অনেকখানি, তাতে সে প্রচুর ধান কেটে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে এসেছে। গর্তে পড়া গাড়ি তুলতে গিয়ে তার হৃদযন্ত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ধানের আঁটি ধরে বাঁচার অবিরাম চেষ্টা তার :

> সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলে তার গাড়িতে বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগায় ফলন্ত ধান। জোরে, সজোরে চেপে ধরলে। নইলে প'ড়ে যাবে সে। গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠা ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত। বার কতক পা দুটো ছুঁড়লেÍ নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতের ধূলার উপর, এক মুখ ধূলা কামড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধান–ভরা মুঠা-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পরমুহূর্তে। [২৮]

মুকুন্দ পালের ভেতর দিয়ে লেখক বাংলার কৃষিজীবী শ্রেণীর একটা রূপ তুলে ধরেছেনÍ দুর্ভিক্ষে মহামারিতে বিপর্যস্ত হলেও চেষ্টা, স্বপ্ন এগুলো বিপর্যস্ত হয়নি।

'তমসা'

(দৈনিক বসুমতী, নববর্ষ ১৩৫২)

'তমসা' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পঙ্ক্ষী নামে অন্ধ এক ছেলে এবং খেমটা দলের এক মেয়েকে চিত্রিত করেছেন। খেমটা দলের ভ্রাম্যমান জীবন আর এক জন্মান্ধের যাযাবর জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে এই গল্পে। একজন অন্ধের অনুভূতির জগৎ এই গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। লোকজীবনের বিস্তারিত চিত্র এই গল্পে পাওয়া যায় না। তবে দৃষ্টিহীন মানুষের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গাহ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সুরেলা কণ্ঠের মোহে, কোমল দুখানি পায়ের স্পর্শের মুগ্ধতায় জন্মান্ধ পঙ্ক্ষী একটি খেমটা মেয়ের পেছনে পেছনে চলে যায় কিন্তু খুঁজে পায় না।

গল্পের শেষে পঙ্ক্ষীর জীবনে তমসা এসেছে ঘন হয়ে। রেলওয়ের প্লাটফর্ম ছেড়ে সে তীর্থের ভিখিরি হয়েছে। সেই খেমটা মেয়েটি পঙ্ক্ষীকে একটি আধুলি ভিক্ষা দিয়ে তার সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, পঙ্ক্ষী

বুঝতেও পারে না যে তার স্বপ্ন সামনে দিয়ে চলে গেল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তারাশঙ্কর এই গল্পে গানের ব্যবহার করেছেন। অন্ধ পঙ্ক্ষীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে :

চোখে ছটা লাগিল,
তোমার আয়না – বসা চুড়িতে
মরি মরি, বলিহারি – চোখে যে আর
সইতে নারি,
ঝিকিমিকি ঝিলিক নাচে,
হাতের ঘুরি–ফিরিতে। [২৯]

আবার গায়িকা মেয়েটি গান গেয়েছে :

কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পথের পরে, কভু নদীর পারে
চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার
কাজল-পরা জোড়া আঁখি। [৩০]

এ পর্যন্ত আলোচিত গল্প ছাড়াও দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু গল্প রয়েছে যেগুলোতে লোকজীবনের খণ্ড চিত্র অথবা শুধুমাত্র প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। যেমনÍ 'রাধারাণী' গল্পে কৃষ্ণযাত্রার অধিকারীকে দেখান হয়েছে। আবার 'দেবতার ব্যাধি' গল্পে রাঢ় বাংলার ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :

> পশ্চিম রাঢ়ের পল্লী, লোকেদের কথায় বিচিত্র টান, ঐকার, একার, চন্দ্রবিন্দু, ড়কারের ছড়াছড়ি ; গিয়েছে হয়েছে স্থলে বলে– গেইছে, হইছে ; কেনকে বলে কেনে; খেয়েছিকে বলে 'খেঁয়েচি', হারকে বলে 'হাড়' রামকে বলে 'আম' আর আমকে বলে 'ড়াম'। ডাক্তার শুনে বলে, বারবেরিয়ান্‌স্ ! ব্রুটস ! বাংলাতে বলে, অনার্য বর্বরের দেশ। [৩১]

রাঢ়ের গ্রামের চিত্র থাকলেও এই গল্পে লোকজ জীবনের তেমন প্রকাশ ঘটেনি। একজন ডাক্তার ও হেডমাস্টারকে নিয়ে গল্প এগিয়ে গিয়েছে। স্বকীয় শিল্পস্বভাব ও জীবনদৃষ্টির কারণে তারাশঙ্করের ছোটগল্পে বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর জীবনাচরণের রূপায়ণ হয়েছে জীবনঘনিষ্ঠ।

তথ্য নির্দেশঃ

১. 'প্রতিমা', *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় খণ্ড*, সম্পাদক: অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, সপ্তম মুদ্রণ, আগষ্ট ২০০০) পৃ ১৯

২. 'প্রতিমা', প্রাগুক্ত, পৃ ২০

৩. 'মালাকার', প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯

৪. 'মালাকার', প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১-১৮২

৫. 'মালাকার', প্রাগুক্ত, পৃ ১৮২

৬. 'মালাকার', প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬

৭. 'ট্রিটি', প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৭

৮. 'ট্রিটি', প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৮

৯. 'ট্রিটি', প্রাগুক্ত, পৃ ২০১

১০. 'বেদেনী', প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৪

১১. 'তারাশঙ্করের ডাইনীরা', *তারাশঙ্কর: আলোকিত দিগ্বলয়*, সম্পাদক: পল্লব সেনগুপ্ত (কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৭) পৃ ২৫৭

১২. 'ডাইনী', প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৪

১৩. 'তারাশঙ্করের ডাইনীরা', প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৪

১৪. 'রাঙাদিদি', প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৬

১৫. 'রাঙাদিদি', প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৫

১৬. 'পিঞ্জর', প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৫

১৭. 'চোর', প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৯

১৮. 'চোর', প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৪

১৯. 'কবি', প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৭

২০. 'কবি', প্রাগুক্ত, পৃ ৩২২-৩২৩

২১. 'একরাত্রি', প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৯

২২. 'একরাত্রি', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৪

২৩. 'যাদুকরী', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৬

২৪. 'যাদুকরী', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭১-৩৭২

২৫. 'যাদুকরী', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৪

২৬. 'যাদুকরী', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৩

২৭.'পৌষ-লক্ষ্মী', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৫

২৮.'পৌষ-লক্ষ্মী' প্রাগুক্ত, পৃ ৫১১

২৯.'তমসা', প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮৩

৩০.'তমসা', প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮৬

৩১.'দেবতার ব্যাধি', প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৯-৫২০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পর্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ

(১৩৫৩-১৩৭৭)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলোর মধ্যে কালক্রম অনুযায়ী শেষের দিকের গল্পগুলো তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা উপলক্ষে প্রকাশিত অর্ধশতাধিক গল্প এই পর্যায়ের অন্তর্গত। শেষের দিকের গল্পে কোথাও ঘটনার আধিক্য রয়েছে কিন্তু লোকজীবনের বাস্তবতাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। রাঢ় বাংলার পটুয়া, চণ্ডাল, বেদের মেয়ে, বৈরাগী, চাষী, সাপুড়ে, সাঁওতাল, সন্ন্যাসী, যাদুকর সবাই নিজ নিজ জীবন-বাস্তবতা নিয়ে উঠে এসেছে পাঠকের সামনে। 'কামধেনু' গল্পের পটুয়া, 'পাটনী' গল্পের শ্মশানের ডোম, ' বেদের মেয়ে'-র বেদেনী, 'বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা'-র বোষ্টম, 'প্রহ্লাদের কালী' গল্পের ডাকাত, 'বরমলাগের মাঠ'-এর চাষী আর বেদেনী, 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলী' গল্পের বাজিকর, 'কমল মাঝির গল্প'-র সাঁওতাল-সর্দার, 'সাপুড়ের গল্প' গল্পের বেদের মেয়ে, 'একটি প্রেমের গল্প'-র সাঁওতাল, 'যাদুকরের মৃত্যু'-র যাদুকর'Í এদের জীবনবাস্তবতা গল্পকারের ব্যাপক জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে।

কামধেনু

(কথাশিল্প, আশ্বিন ১৩৫৩)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পটুয়াদের নিয়ে একাধিক ছোটগল্প লিখেছেন, কোথাও পটুয়াদের সামাজিক জীবন, কোথাও কোনো পটুয়ার ব্যক্তিগত জীবন আবার কোথাও বা তাদের অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়ার চিত্র রয়েছে। 'রাঙাদিদি' গল্পে বৃদ্ধ পটুয়ার তরুণী স্ত্রীর জীবনের কিছু খণ্ডাংশ তুলে ধরা হয়েছে। 'কামধেনু' গল্পেও লেখক একজন পটুয়াকে উপস্থাপন করেছেন যার নাম নাথু। কিন্তু নাথুর পটুয়াজীবন নয়, কামধেনু নামের এক গরুকে কেন্দ্র করে নাথুর জীবনের কিছু অংশ চিত্রিত হয়েছে। নাথু গরুর চিকিৎসা করে কবিরাজি পদ্ধতিতে। কিন্তু পেশা হিসেবে সে এটাকে নেয়নি। সে ভিক্ষা করে জীবিকানির্বাহ করে। চিকিৎসা ফি বা ঔষধের দাম বাবদ সে কারও কাছ থেকে কোনো টাকা নেয় না, কিন্তু কেউ যদি খুশি হয়ে কিছু দেয় সে হাত পেতে নেয়। কামধেনু নামের গরুটি প্রসব ছাড়াই দুধ দিতে শুরু করলে নাথুর উপার্জনের আরেকটি পথ খুলে যায়। বেশি দামে দুধ বিক্রি করলেও লোকে তা আশীর্বাদ হিসেবে মেনে নিত। এভাবেই নাথুর জীবন চলতে লাগল :

> রাজার ঘরের মেয়েÍ রাজার ঘরের রাণীÍ রাজার মাÍ রাজবুদ্ধি। মায়ের বুদ্ধি আর মা সুরভির মাহাত্ম্য! নাথুর সংসার পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কামধেনুর শিঙ দুটিতে সে পিতলের খাপ পরিয়ে দিলে। গলায় ঝুলিয়ে দিলে চার সারি লাল সবুজ হলুদ কালো পাথরের মালা, তার সঙ্গে ঘুঙুর, ঘণ্টা, পিঠে চাপিয়ে দিলে ছাপানো কাপড়ে কড়ি গেঁথে সুন্দর দোলাই। মাকে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরত। পরীক্ষা দেখাত কামধেনুর বাঁট টিপে দুধ বার করে। বেলা দুপহর পর্যন্ত গেরস্তের দোরে ঘুরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের কোন দিঘির ঘাটে এসে বসে নিজে মুড়ি চিবুত; কামধেনুর সামনে বিছিয়ে দিত একখানি গামছা, তাতে ঢেলে দিত ভিক্ষার চালের কিছু চাল, কামধেনু চালগুলি খেত, তারপর উঠে এসে নাথুর পিঠ চাটত, মাথার চুল চাটত। [১]

কিন্তু বিপর্যয় শুরু হয়ে যায় একের পর এক। মহামারণ, বন্যা, ভূমিকম্প, আকাল-দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিল, কামধেনুর দুধ শুকিয়ে গেল, ভূমিকম্পের বছরে নাথুর স্ত্রী ঘরবাড়ি চাপা পড়ে মারা গেল। কিন্তু এতসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি নাথুর মনে আর এক বিপর্যয় ঘটে গেল। নাথুর সামনে এসে দাঁড়াল ফুলমণিÍ জগদীশ পটুয়ার বিশ বছরের যুবতী মেয়ে। ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ও স্ত্রীকে হারিয়ে নাথুর আর নতুন করে সংসার করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ফুলমণিকে নাথুর কাছে স্বর্গের অপ্সরীর মতো মনে হল। "মুনি ঋষিদের সামনে স্বর্গের অপ্সরারা ঘাড় বেঁকিয়ে, গালে একটি আঙুল রেখে, একটু হেলে যেমন ভাবে এসে দাঁড়াত, তেমনই ভাবে এসে দাঁড়াল।" [২] ফুলমণির স্বামী হাঁপানির রোগী। দুর্ভিক্ষের বছরে সে অভাবের তাড়নায় ফুলমণিকে পাঁচ মণ চাল আর একশো টাকা নিয়ে হেফাজদ্দি শেখ পাইকারকে বিক্রি করার ফন্দি করছিল; কিন্তু সেটা বুঝতে পেরে ফুলমণি বাবার বাড়ি পালিয়ে আসে।

এই ফুলমণির প্রেমে পড়ে নাথু তার কামধেনুকে বিক্রি করে দেয় একশো টাকা আর পাঁচ মণ চালের বিনিময়ে। নাথু ফুলমণিকে নিয়ে ভাল থাকতে চেয়েছিল কিন্তু কামধেনুকে অন্যের কাছে বিক্রি করে সে শান্তি পাচ্ছিল না। গরুটিকে সে দেখতে যেত এবং ভাল খাবার পেয়ে আবার লাবণ্যময়ী হয়ে উঠতে দেখে তার আফসোস হত। কিন্তু এই কামধেনুকেই সে খাবারের সঙ্গে বিষ খাইয়ে মেরেছিল। এই পাপের ভার সে বইতে পারছিল না। কামধেনুর চামড়া সে কিনে নেয় আর ফুলমণিকে হেফাজদ্দির কাছে দুশ টাকায় বিক্রি করে হেফাজদ্দির সঙ্গে চামড়ার ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে এক গো-হত্যাকারী তার সামনে পড়লে নাথু তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে এবং পরবর্তীতে তার ফাঁসির আদেশ হয়। তখন নাথুর পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। সে গরুর মতো হাম্বা হাম্বা ডাকে, আবার

ফুলমণির চোখ আঁকতে গিয়ে কামধেনুর চোখ এঁকে ফেলে। জেলের ওয়ার্ডারের কাছে সে কয়লা চায় :

> ওয়ার্ডারটা ফিরে এসে এক টুকরো পোড়া কয়লা ছুড়ে দিয়ে গেল। নাথু সাগ্রহে কুড়িয়ে নিয়ে একটা কোণে বসে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। চোখ আঁকতে লাগল। 'সুরভিমঙ্গল' গান গেয়ে ভিক্ষে করে দিন কাটালেও নাথু পটুয়ার ছেলে। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত, নাথু চিত্রকর; জাতিতে পটুয়া, ধর্মে ইসলাম। তুলি একেবারে না ধরা নয়। ছবি আঁকার খেয়ালটাও তার পাগলামি নয়। সে পাগল হয়ে যায় নি, ফুলমণির চোখ দুটো মনে পড়ে বুকে তার নেশা জেগে উঠেছে। খেয়াল হয়েছে, য-দিন বাঁচবে, ফুলমণির চোখ দুটো বসে বসে দেখবে। বড় বড় ডবডবে দুটো চোখ ! [৩]

নাথু পটুয়ার আলোছায়া-ঘেরা মনোজগতে এভাবে বিচরণ করেছেন লেখক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পটির পাশে তারাশঙ্করের এই গল্পটি অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে।

পাটনী

(গল্পভারতী, বৈশাখ ১৩৫৪)

'পাটনী' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্মশানের চণ্ডালদের তুলে ধরেছেন। চণ্ডালদের জীবনের গল্প শুরু করে লেখক শ্মশান-চণ্ডালদের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি মিথ উল্লেখ করেছেন :

> "মা গঙ্গা ব্রহ্মা-কমণ্ডলু থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গ থেকে মর্ত্যভূমে অবতরণ করে সগর সন্তানদের উদ্ধার করবার জন্য চলেছিলেন; পথিমধ্যে বঙ্গদেশে এবম্প্রকার ঘটনাটি ঘটেছিল। ভগীরথ বিব্রত হয়ে ভাবছেন, এমন সময় বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল হাজার হাজার মানুষ। তারা চণ্ডাল। তারা এসে দলে দলে লেগে গেল সেই হাড়ের স্তূপ সরিয়ে মায়ের জন্য পথ রচনার কাজে। এক ফালি পথ তৈরী হল বহু পরিশ্রমে, তখন মা তার মধ্যে দিয়ে বের হলেন বিপুল বেগে। হাড় মানুষ সব ভেসে চলে গেল মায়ের ঐরাবত–ভাসিয়ে-দেওয়া পাহাড়-প্রমাণ ঢেউয়ে। বাঁচল মাত্র একজন চণ্ডাল। সে জোড়হাত করে ডেকে বললে, হে দেবতা, এই কি তুমি দিয়ে গেলে তিনকালের জমা-করা জানোয়ারের হাড় সরিয়ে তোমার পথ করে দেওয়ার ফল?
> মা গঙ্গার এতক্ষনে সম্বিৎ ফিরল। তিনি লজ্জিত হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, বাছা দুঃখ করো না, তোমার আত্মীয়-জ্ঞাতিদের আমি চণ্ডাল জন্ম থেকে মুক্তি দিয়ে স্বর্গলোকে অক্ষয়বাসের সৌভাগ্য দিয়েছি।

> চণ্ডালটি তখন কাঁদতে কাঁদতে বললে, তবে মা, আমি কি অপরাধ করেছি যে, ওই ভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হলাম !
>
> মা বললেন, অপরাধ নয় বাছা, তোমার পুণ্য ওদের সকলের চেয়ে বেশি, তাই তুমি থাকলে।
>
> চণ্ডাল বললে, রহস্য করছ মা?
>
> মা হাসলেন, বললেন, না। তুমিই প্রথম হাড় সরিয়েছ। তাই তুমি থাকলে আর তোমার বংশ থাকলÍ এই ঘাটে শ্মশানদণ্ড-হাতে পাপী তাপী জীবজন্তুকে নরক থেকে পরিত্রাণ করে শিবলোকে পার করবার পাটনী হয়ে। আমার জলের মাহাত্ম্য অক্ষয়, কিন্তু এই আমার গর্ভে এই ঘাটে তোমার বংশাবলীর হাতে যার চিতা জ্বলবে, তার স্থান হবে শিবলোকে। যে লোকের রাজার জটায় আমার বাস, সে লোকে, বিরাজ করেন জগন্মাতারূপে আদ্যাশক্তি, যে লোকে বৃষভে এবং সিংহে, ময়ূরে মূষিকে এবং সর্পে একসঙ্গে বাস ক'রে বিচরণ করে সমান মর্যাদায়, সমান স্নেহে, সেই পরম মঙ্গলময় ঐশ্বর্যহীন চৈতন্যময় শিবলোকে।" [৪]

গল্পটিতে শ্মশানের চিত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শ্মশানের একদিকে রয়েছে তলদেশ বাঁধানো একটি বটগাছ, বেঁদিতে সিঁদুর-মাখানো ত্রিশূল পুঁতে রাখা হয়েছে। এই ত্রিশূল আর অহরহ জ্বলতে থাকা পোড়াকাঠের ধুনি সামনে নিয়ে একজন সন্ন্যাসী বসে থাকে। চণ্ডালদের পাশাপাশি কারখানা, রাইসমিল, চিনিরকল এগুলোও উঠে এসেছে। এসব কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন, স্ট্রাইক ব্যাপারগুলো বাদ যায়নি। এসব কারখানার মজুরদের মধ্যে ওই পাটনীরাই সংখ্যায় বেশি। আদিকালে মা-গঙ্গা যে পাটনীকে বাঁচিয়েছিলেন, তার বংশধর নিয়ে একটি গ্রাম গড়ে উঠেছে। ঘর পঞ্চাশেক পাটনী পরিবারের পুরুষের সংখ্যা একশো'র বেশী, মেয়েদের সংখ্যা তাদের থেকে বেশি, অল্প বয়সী অর্থাৎ দশ থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কম নয়; এরাও কারখানায় কাজ করতে যায়। তারাশঙ্কর অন্য শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেনÍ "পাটনীরা ছাড়া আরও মজুর আছে, কিছু সাঁওতাল, কিছু রাঢ়ের বাউরী, হাড়ী।" [৫]

এই গল্পের প্রধান চরিত্র কপিল কারখানায় কাজ করে আবার শবের দেহ থেকে অলঙ্কারও খুলে নেয়। কিন্তু পরবর্তীতে তার মধ্যে পাপ-পুণ্য বোধ জেগে ওঠে। এই গল্পটিতে কিছু শহুরে সমস্যাও চিত্রিত হয়েছে। পাটনীদের মাতব্বর হল কপিল। কপিলের মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন যে পেটের দায়ে পাটনীরা এখন মজুর খাটে। কারণ :

> জমিদারের জমি, তার দরুন আধা বখরা তাঁর। তাঁর আবার গোমস্তা আছে, হিসেব রাখে, কোথাকার পারের যাত্রী, কি বৃত্তান্ত, তার দরুন দু আনা সে বেটার। বাকী ছ আনা থাকে, তার আদ্ধেক পাবে শ্মশানের দণ্ডধারী, আর আদ্ধেক পাবে যার যেদিন পালা সে। বাকী লোকের হবে কি? খাবে কি?[৬]

এভাবে পাটনী জীবন উঠে এসেছে গল্পটিতে। তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কারখানা ট্রেড ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট-কর্মী এসব প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে এবং পাটনীদের জীবনের সঙ্গে কোথাও কোথাও এসে মুখোমুখি হয়েছে।

বেদের মেয়ে

(শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৫৬)

'বেদের মেয়ে' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ একটি ছোটগল্প। বেদেদের লাগামহীন ছন্নছাড়া জীবন লেখক তুলে ধরেননি, বরং বেদেদের গৃহস্থ হয়ে উঠবার একটা কারণ এখানে তিনি দেখিয়েছেন। পাশাপাশি দেখিয়েছেন গার্হস্থ্য জীবনে থিতু হয়েও এদের রক্তের মধ্যে বর্বরতা, অসভ্যতা, কুপ্রবৃত্তি প্রায়ই জেগে ওঠে। চুরি, ডাকাতি এসব অবলম্বন করে তারা গ্রামের অন্য পেশার মানুষদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। গার্হস্থ্যজীবনে অভ্যস্ত হলেও গ্রামের লোকজন তাদের বেদে জাত হিসেবেই গণ্য করত এবং এড়িয়ে চলত। বেদেদের দূরে দূরে রাখতেই তারা সচেষ্ট থাকত। গল্পে উল্লেখ আছে :

> কাচের ঢাকার মধ্যে দুর্লভ ফুল ঢেকে রাখে। তার চারিপাশে ঘুরে বেড়ায় নীল মাছি। তেমনি ভাবে শিবি এবার ঘুরতে লাগল গুপ্তপাড়ায়।
>
> চকিত হয়ে উঠল লোকে। নীল মাছি– নর্দমায় উৎপত্তি, সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে লোকে সাবধান হয়, চকিত হয়।
>
> লোকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করলে। গ্রাহ্য করলে না শিবি।
>
> তারপরও ঘুরতে দেখে ওকে লোকে সাবধান করে দিলে– এ পাড়ায় কেন?
>
> আমার খুশি। পাড়ার পথে ঘুরি, কারুর ঘরে ঢুকি না, সরকারী পথ, ইউনান বোর্ডের ট্যাক্স দি; একশো বার হাঁটব।[৭]

বেদের মেয়ের স্বাধীনচেতা মনোভাব এই গল্পে শিবির মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছেন। বেদে জীবনের ঘনঘটা নেই এই গল্পে। কিন্তু বেদের মেয়ের মনের কয়েকটি দিক উন্মোচিত হয়েছে। ভোলা

ডাকাতের স্ত্রী হওয়ার পরেও শিবি প্রভাতকে দেখে চমকে ওঠে। প্রভাত ঘটনাক্রমে শিবির হাত ধরলে শিবি একইসঙ্গে চমকে এবং শিউরে ওঠে। শৈশবে প্রভাতকে শিবির ভাল লেগেছিল। সেই ভালবাসার কথা শিবি নিজেও ভুলে গিয়েছিল কিন্তু প্রভাতকে পরবর্তীতে দেখে তার মনের কোণায় আবার কী যেন নেশা লেগে গেল। এই নেশা কামনার নয়, হয়তো বা ভালবাসার। পুলিশের হাত থেকে প্রভাতকে শিবি রক্ষা করতে চেয়েছিল কিন্তু রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রভাত শিবির আড়ালে কাথার নিচে লুকোতে রাজি হয়নি। শিবি প্রভাতকে ফেরাতে পারেনি এবং প্রভাত পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে জেল খেটেছে।

গল্পের পরিণতিতে লেখক শিবির হাতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা তুলে ধরেছেন। স্বামী ভোলা ডাকাতকে সে একই ভাবে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু কাকতালীয় ভাবে পুলিশের সঙ্গে ছিল প্রভাত এবং মানুষকে লুকিয়ে রাখার এই বুদ্ধি পুলিশকে সে জানিয়ে দিল। শিবি ভোলাকে পালানোর সুযোগ করে দেয়ার জন্য পুলিশের সঙ্গী লোকটিকে ছুরিকাহত করেছিল। পরে যখন জানল ছুরি মেরেছে সে প্রভাতকে, তখন তার মনে হল যে নিজের বুকেই যেন সে ছুরি মেরেছে। এভাবে লেখক জীবনের কিছু না বলা ভাললাগার কথা জানিয়ে দিলেন পাঠকের কাছে।

বাঞ্ছাপূরণ

(শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৫৭)

বোষ্টম-বাউল-বৈরাগী এদের নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক গল্প লিখেছেন। কাননবিহারী গোস্বামী বলেছেন :

> কবিতায় যা ছিল রাঢ়ের বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সশ্রদ্ধ স্মরণ, তারাশঙ্করের ছোটগল্পে তা প্রবেশ করল বৈষ্ণব জীবনধারার জীবন্ত অঙ্গনে। মহাপ্রভুর উদার প্রেমধর্ম রাঢ়ের জনজীবনকে, বিশেষতঃ নিম্নবর্গীয় নরনারীর জীবনকে, গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তারাশঙ্কর এদের মধ্যে বোষ্টম ও বাউল শ্রেণীর মানবমানবীর জীবনচিত্রণে সিদ্ধহস্ত। বোষ্টমদের মধ্যেও আখড়াধারী গৃহী জাতবোষ্টম এবং ভেকধারী বোষ্টমের পার্থক্য দেখিয়েছেন। [৮]

'রসকলি', 'মালাচন্দন' রাইকমল' অনেক বিখ্যাত গল্পে এসব গোষ্ঠীর জীবনের বিভিন্ন দিক লেখক তুলে ধরেছেন। 'বাঞ্ছাপূরণ' গল্পটিতেও লেখক একজন বোষ্টমের জীবনের কথা তুলে ধরেছেন যে তার গোটা জীবনেই কল্পনার এক রাধা খুঁজে বেড়িয়েছেন।

> 'আমার মনের রাধায় খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে।
> রাধা আমার রইল কোথা, গোলকধাঁধার কোন্ গোপনে ! '
> বহুবল্লভ বৈরাগীর গানের ভাঁড়ারের প্রথম ভাঁড়ে ওই গানটি আছে। যে কোন গৃহস্থের দরজায় এসে একতারা বাজিয়ে ওই গানটি সে ধরবেই। [৯]

বাউণ্ডুলে বৈরাগী ছিল এই বহুবল্লভ। নিরুদ্দেশ হয়ে যেত। 'ও আমার মনের রাধা খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে'– এই গান ছিল তার কণ্ঠে সবসময়। বিভূতির আহ্বানে কিছুদিন যাত্রার দলে ঘুরে পরে কুসুমকে বিয়ে করে সংসারী হয়। কুসুমকে রাধে বলে সম্বোধন করে। কিন্তু সেই স্ত্রীকেও তার বেশিদিন ভালো লাগল না। তারপর কাদম্বিনীকে দেখে তার মধ্যে রাধাকে খুজতে লাগল। কিছুদিন পর তার মনে হল কাদম্বিনী আর কুসুমের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কাদম্বিনীকে রেখে সে গ্রামে এসে দেখল কুসুমও অন্য লোককে বৈষ্ণব-ধর্মমতে বিবাহ করে চলে গিয়েছে। তারপর সুবাসীর সঙ্গে আটমাস বসবাস করে। রাধাকে খুঁজতে খুঁজতে এক ঝুমুর দলের মেয়ে গোলাপের সঙ্গে তার পরিচয় হল। ততদিনে যৌবন পেরিয়ে গিয়েছে। গোলাপ টাকার লোভে বহুবল্লভের সঙ্গে লেগে থাকে, তারপর নেশায় অচেতন করে ছুরি মেরে টাকা নিয়ে চলে যায়। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে বহুবল্লভের নেশার ঘোরে মনে হয়েছিল যে তার রাধা এসেছে। এভাবেই এক বাউণ্ডুলে বৈরাগীর জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে এই 'বাঞ্ছাপূরণ' গল্পে।

বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা
(শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৫৮)

'বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা' গল্পে গোবিন্দদাস ব্রাহ্মণ দেখতে অতিশয় কুৎসিত হলেও রূপবতী সতীকে বিয়ে করে। সতীর পিতাকে হাজার টাকা পণ দিয়েছিল বিয়ে করার জন্য। কিন্তু সতী গোবিন্দদাসের কুরূপের কারণে তার সংসার ছেড়ে যাত্রাদলের নায়ক কৃষ্ণদাস বোষ্টমের সঙ্গে চলে যায়। কৃষ্ণদাসের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে সতী কণ্ঠীবদল করে তাকে বিয়ে করে। কণ্ঠীবদল বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত একটি বিবাহ-রীতি। বৈষ্ণব সমাজে গিয়ে সতীর নাম হয় ভামিনী। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গোবিন্দদাস ভেক ধরে বৈষ্ণব হয়ে কৃষ্ণদাসের পাশে আখড়া গড়ে তোলে। বোষ্টম গোবিন্দদাসের বর্ণনায় তারাশঙ্কর বলেছেন:

> আধপাকা দাড়ি-গোঁফ, আধপাকা লম্বাচুল, কপালে তিলক, নাকে রসকলি, মাথার লম্বা চুলগুলি রাখালচূড়া করে ব্রহ্মতালুতে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা। [১০]

ব্রাহ্মণ থেকে ভেক ধরে বোষ্টম হলেও গোবিন্দদাস পূর্ণমাত্রায় বৈষ্ণবগিরি করতে লাগল। বোষ্টমরা ভিক্ষা করে জীবিকানির্বাহ করে, গোবিন্দদাসও ভিক্ষা করে টাকা জমিয়ে কৃষ্ণদাসের নিলামে ওঠা আখড়া কিনে নেয়। গোবিন্দদাস প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল; কৃষ্ণদাসের সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে নিজে খুশি হতে চেয়েছিল। পরে প্রতিশোধের কথা ভুলে সতীকে ফিরে আসতে বলে। সতী সেটাতেও রাজী হয়নি। ঘটনাক্রমে সতী গোবিন্দদাসের সন্তান ধারণ করলেও তার সঙ্গে সংসার করতে চায় না। শুধুমাত্র বিগ্রহ চাইতে এসেছিল সতী। গল্পের পরিণতিতে সতী আর তার সন্তানকে সব সম্পত্তি দান করে গোবিন্দদাস অজয়ের কলঙ্কিনীর দহে ডুবে আত্মহত্যা করে, এতে গল্পের কাহিনীতে নাটকীয়তা যুক্ত হয়েছে। তারাশঙ্কর এই গল্পে বোষ্টমদের আখড়ার সুন্দর একটি চিত্র তুলে ধরেছেন:

> অজয়ের তীরে একখানি গ্রামে একটি আখড়া। আম-জাম-কাঁঠালের গাছ। গাছগুলির বয়স দশ-বারো বৎসরের বেশী নয়। গুটি চারেক নারকেল গাছ। [১১]

প্রহ্লাদের কালী

(শিলাসন, মাঘ ১৩৫৮)

'প্রহ্লাদের কালী' গল্পে ভল্লা শ্রেণীর ডাকাতের দুর্ধর্ষ জীবনের প্রসঙ্গ উপস্থাপনে তারাশঙ্কর অনেক বেশি সাবলীল। চৌর্যবৃত্তির বাস্তব-উপস্থাপনা দেখা যায় 'চোর', 'চোরের মা' গল্পে, পাশাপাশি ডাকাত শ্রেণীও তারাশঙ্করের লেখনীতে পাঠকের সামনে স্পষ্ট রূপ পেল। 'প্রহ্লাদের কালী' গল্পে প্রহ্লাদ ভল্লা ডাকাতের কালী-ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। প্রহ্লাদ ভল্লা পুরুষানুক্রমিকভাবে অপরাধকর্মের সঙ্গে লিপ্ত। তার বাবা ছিল দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল। প্রহ্লাদ তরুণ বয়স থেকেই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। সে ডাকাতিতে উল্লাস বোধ করত। রাজনীতি, দাঙ্গা এগুলোর সঙ্গে সে যুক্ত ছিল না। প্রকাশ্য হত্যা-ডাকাতি তার পক্ষে ছিল সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এই ডাকাতেরও পরাক্রম কমে আসল। নতুন ডাকাত ঘনশ্যাম ডাকাতের সর্দার হিসেবে প্রহ্লাদের স্থানে এসে বসল। প্রহ্লাদের ডাকাতির বিশেষত্ব একরকম আর ঘনশ্যামের ভিন্নরকম:

> ঘনশ্যাম দাস অ্যাবস্কাণ্ডার।
>
> পঁচিশ বছরের তাজা জোয়ান। লম্বা ছ'ফিট; খাড়া নাক। দুর্দান্ত শক্তিশালী, দুরন্ত সাহসী। এ অঞ্চলের শতকরা আশিটি ক্রাইমের নায়ক। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় আছে, ডাকাতিতে আছে, লুঠেও আছে। আদর্শ নেই, উল্লাস আছে। সে নিজের ভাগ নিয়ে সরে যায়। ছোরা, লাঠি, সড়কি, একটা ভাঙা বন্দুকও তার আছে। কিন্তু সে ফেরার।

> তার পিছনে আই.বি., সি. আই. ডি. ঘুরছে। কবে কোথায় সে থাকে কেউ বলতে পারে না। পলিটিক্যাল অর্ডিনারী দুই পথেই তার আনাগোনা। [১২]

এই নব্য ডাকাতের হাতে বৃদ্ধ ডাকাত প্রহ্লাদ ভল্লা গুলির আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, ডাকাতির ঐতিহ্য যেন এক যুগ থেকে অন্য যুগে প্রবাহিত হল। সন্ন্যাসী সাধু বাবার কাছ থেকে একটি তরবারি প্রহ্লাদ পেয়েছিল, সেই তরবারিটি ঘনশ্যামের অধিকারে চলে আসল। ডাকাতি-ঐতিহ্যের ক্রমধারার পাশাপাশি প্রহ্লাদ ডাকাতের কালী-ভক্তিও এই গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। এই কালী-ভক্তির কারণে তার পেশাগত জীবনে সফলতা এসেছেÍ এ বিশ্বাস প্রহ্লাদের প্রবল। ঘনশ্যাম সেই তরবারি দখলে নেওয়ার জন্য প্রহ্লাদকে গুলি করে। আহত প্রহ্লাদের মনে হয় যে মা-কালী তাকে ছেড়ে ঘনশ্যামের সঙ্গে চলে যাচ্ছে। এভাবে প্রহ্লাদ ডাকাতের অতীতের জয় আর বর্তমানের পরাজয় অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে।

বরমলাগের মাঠ

(চতুরঙ্গ, ১৩৬০)

'বরমলাগের মাঠ' ছোটগল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার ও কৃষকের দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। বেদেনীর কিছু বিষয়, তাদের জীবনাচরণ, সাপ ইত্যাদি প্রসঙ্গও সমানভাবে উঠে এসেছে। লোকজীবনের অংশগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরে গল্পকার বাকি বিষয়গুলোকে সম্পৃক্ত করেছেন। ভাগচাষী বলরাম মূল কাহিনীটির বক্তা। তার তিন পুরুষের কথা উঠে এসেছে। বলরামের ঠাকুর্দা নটবর লালমণি নামের বেদের মেয়েকে নিয়ে দেশান্তরি হয়ে অনত্র কৃষকের কাজ করে সংসার শুরু করেছিল। কিন্তু জমিদার মহাজন যখন তাদের ফলানো ফসলের বেশিরভাগ নিয়ে নিল তখন এই অত্যাচার আর বঞ্চনায় নিজেদের বাঁধাঘরে আগুন দিয়ে লালমণি আবার বেদেনী শ্রেণীর যাযাবরবৃত্তি গ্রহণ করল। ঘটনাক্রমে লালমণি মারা গেলে নটবর লালমণির কাছ থেকে পাওয়া কাঁউর বিদ্যার বিশ্বাস দিয়ে, গুপ্ত বিদ্যা দিয়ে সাহসী হয়ে উঠেছিল। সবাই তাকে গুণীন বলত। এই নটবর পরবর্তীতে ব্রহ্মনাগ বা বরমলাগ হত্যা করেছিল এবং অভিশপ্ত বরমলাগের মাঠকে সুফলা করে তুলেছিল। এই মাঠের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক:

> বলরাম বললে, বাবু, ওই জমি আমার মা-লক্ষ্মী। দু পুরুষ ওই জমি করছি। বরমলাগের মাঠ, লাগের বিষে হোথা ঘাস গজাত না, ধু ধু করত।
> শিবনাথ সচকিত হয়ে প্রশ্ন করল, কি কি? লাগের বিষে ধু ধু করত? মানে?

> লাগ মাশায়Í ব্রহ্মলাগ ! সাপ ! ভেষণ সাপ।
>
> ও নাগ ! ব্রহ্মনাগ !"
>
> আজ্ঞেন হ্যাঁ। সাপের সাপা। তার বিষে ঘাস গজাত না ওখানে। ধু ধু করত লাল পোড়ামাটির মাটির ডাঙা।
>
> পুরাকালের-গড়া পাথরের দৈত্যমূর্তি কি ভৈরবমূর্তির মত অবয়ব বলরামের, তার হাতের তেলো দুখনিও সেই অনুপাতে গড়া; বরং লাঙলের মুঠো এবং কোদাল–কুড়লের বাঁট ধ'রে বোধ করি অনুপাতের শোভনতাকে ছাড়িয়ে একটু বেশী স্থূল, বেশী চওড়া। হাতের তেলো দুখানিকে পাশাপাশি জুড়ে ঈষৎ বেঁকিয়ে সাপের ফণার মত করে বললে, এই এমনি কুলোর মত ফণা মশায়, ঘোর কালোÍ মা কালীর অঙ্গের মত বরণ, সেই কালোর ওপার কুলোর মত ফণায় শ্বেতবরণ চক্কর ! ভেতরের দিকটি– মানে, গলা পেট দুধের মত সাদা। ফণা তুলে দাঁড়াত মাশায়, মানুষের বুক বরাবর উঁচু হয়ে উঠত। লক লক বরত দু'খানি জিভ। উদয়কালে একবার, আর একবার ঠিক 'সনজের' সময়। ওই ডাঙার ধারে গেলেই লোকে দেখতে পেত, ফণা তুলে সূর্যের পানে তাকিয়ে দুলছেন। বাঁয়ে একবার, ডাইনে একবার, মধ্যে মাঝে ছোবল দিয়ে ঝড়ার মত মাটিতে পড়ছেন 'সাঁট-পাট' হয়ে। ছোবল মারছেন না, সূর্যিদেবকে পেনাম করছেন। তিনিই ছিলেন ওখানে। তাঁর বিষে ওখানকার মাটি পোড়ামাটির মতন লাল হয়ে গিয়েছিল। ঘাস হ'ত না, জীব-জন্তু মানুষ-জন কেউ যেত না। ধুধু ধুধু করত। সেই ডাঙা আমার বাবা ভেঙেছিল মাশায়। [১৩]

সেই জমিতে একবার বৃষ্টির সময় ওপরে অনেক মাটির চাঙর ধসে পড়ে ভিতরের উর্বর মাটি বের হয়ে আসল। বরলাম বিশ্বাস করে নটবর সেখানকার মহানাগকে মারার পর ব্রহ্মনাগ হত্যার পাপ লেগেছে। সেই পাপ বিভিন্ন বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে বলরামের জীবনে দেখা দিল। তখন ১৯৪৬ সাল, তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছে :

> ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার জন্য সপরিবারে শিবনাথ দেশে এসে বাস করছে। দেশে এসেও শান্তি নাই। চাষী কৃষাণদের মধ্যে ঢেউ উঠেছেÍ তেভাগা। এতদিন মনিবে পেয়েছে দুভাগ, এবার তারা দাবি করছে দু ভাগ। [১৪]

সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ গল্পের মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। বলরাম শিবনাথের গুলিতে আহত হয়। সে ভাবে বরমলাগের জন্যই তার জীবনে এমন অভিশাপ লেগেছে। এভাবে লোকজীবনের অন্ধ কুসংস্কারের পাশে কৃষক বিদ্রোহের দিকটিও তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন।

আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলী

(শারদীয়া, ১৩৬২)

বাজিকর, সার্কাস দেখায় এরকম গোষ্ঠীর চিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের ভাণ্ডারে কম নয়। 'বেদেনী' এরকম একটি গল্প। 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলী' গল্পে একজন বাজিওয়ালার প্রসঙ্গ এনেছেন লেখক :

> মাঘ মাসে, চণ্ডীমায়ের মেলায় আসত আফজল খেলোয়াড়ী। লম্বা মানুষ, দেহের মাংস যেন হাড়ের সঙ্গে জড়ানো। লম্বা বাবরি চুল, ছাঁটা মেহেদি-রঙানো দাড়ি, চোখে সুর্মা, পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া, মাঝারি একটা তাঁবু খাটিয়ে বসত মেলার দক্ষিণ দিকে। একটা জয়ঢাক বাজত। 'ছারকাছ ! ছারকাছ ! ছারকাছ'!
> সে-বয়সে আফজলের সার্কাস বড় ভালই লাগত। আফজল আর তার ছেলে কসরত দেখাত। কতরকম কসরত ! তারপর ছাগল আর ভেড়ার খেলা। তারপর টিয়াপাখির খেলা। শেষের খেলা ছিল ঘোড়ার। [১৫]

ছোটখাটো হাড়-জিরজিরে একটা ঘোড়া নিয়ে সে আর তার ছেলে খেলা দেখাত। ঘোড়াওয়ালা আর আগা সাহেবের অভিনয় করে দর্শককে মোহিত করে রাখত। এভাবে সার্কাস চালাত আফজল খেলোয়াড়ী। কিন্তু পরে ঘোড়াটা মরে যায় আর ছেলেরা অন্য পেশায় চলে যায়। সে-ও বয়স হয়ে গেলে ভিক্ষে করে দিন কাটায়। ঘটনাক্রমে একটা বাঘ পেয়ে যায় যার নাম রাখে রমজান শের আলী। এই বন্য প্রাণীটিকে সে নিজের সন্তানের মতোই মনে করত এবং তাকে নিয়ে আবার শুরু হল তার সার্কাস। বাঘের খেলা দেখানোর বিস্তারিত বর্ণনা গল্পকার উপস্থাপন করেছেন। আসল বাঘের পাশাপাশি নকল তৈরি করা বাঘকেও আফজল সার্কাসের খেলায় নিয়ে আসে। আসল বাঘটা আফজলের কথা শোনামাত্রই পালন করত। শিকারী জমিদারবাবুর গুলিতে বাঘটি আহত হলে আফজল তাকে দুহাত মেলে আদর করতে যাচ্ছিল, তখন বাঘের কামড়েই আফজল খেলোয়াড়ীর জীবন চলে যায়। বাজিকরের মৃত্যুর ঘটনাটিকে লেখক এখানে শিকার কাহিনী বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কমল মাঝির গল্প

(জয়যাত্রা, ১৩৬৩)

সাঁওতালদের নিয়ে তারাশাঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'কমল মাঝির গল্প'। এই গল্পে তিনি সাঁওতালী ভাষা ব্যবহার করেছেন। সাঁওতালদের বৃদ্ধ সর্দার কমল মাঝির মুখ থেকে সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন লেখক; তত্ত্বটি এরকম :

> এই মানুষ দুটির নাম 'হাড়াম' এবং 'আয়ো'Í কমল মাঝি আবার বলতে শুরু করলে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা।
>
> কেউ কেউ বলে 'পিলচু হাড়াম' 'পিলচু বুড়ো' এবং 'পিলচুবটি' অর্থাৎ পিলচু বুড়ি। সেই হিহিড়ী পিপিড়ী দ্বীপে তাঁরা সুন্তুবুকূচ ঘাস ও শ্যামা ঘাসের বীজ খেয়ে বেড়ে উঠলেন।
>
> এই উরাই হলেন মানুষের বাবা মা। উয়াদের হল ছেল্যা-পিলা। বেটা বিটি।
>
> তা পরেতে 'লিটা' ঠাকুর এসে উয়াদের কাপড় পরতে শিখালে। তা পরেতেÍ সব জোড়া চলে গেল ই দেশ উ দেশ। কারুর রং হল সাদা, কারুর হল কাল, কারুর হল হলুদ। তাদের আবার ছেল্যা-পিলা হল। পিঁপড়ার মত পিলপিল করে বাড়ল। দেশ ভরে গেল। তা পরেতে মারামারি লাগালে। এ ইয়ার সঙ্গে ও উয়ার সঙ্গে মারামারি লাঠালাঠি। তীর ধনুক। তা পরেতে তুরা বন্দুক সন্দুক নিয়ে মার করছিস। [১৬]

গল্পে দেখা যায় কমল মাঝি মারামারি হানানহানির বিপক্ষে; সবসময় মীমাংসার পক্ষে, শান্তির পক্ষে। সবাইকে সে শেখায় কীভাবে নিজের ভেতরের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো দমিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু কমল মাঝিও শেষ পর্যন্ত নিজের ক্ষমতালিপ্সা সংযত করতে পারল না। নব্বই-এর ওপর তার বয়স। এতদিন ধরে সে সর্দারের দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু তার মৃত্যু হল মারামারিতে। কারও ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য নয়, ক্ষমতার লোভে নিজেই মারামারি করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে :

> সেই কমল মরেছে।
>
> মরেছে আঘাতের ফলেই। কমলের বুকে একটা ক্ষতচিহ্ন দগদগ করছে। এবার কিন্তু কমল ঝগড়া থামাতে গিয়ে আঘাতটা পায়নি। কমল এবার নিজেই ঝগড়া করতে গিয়েছিল। এই বিরানব্বুই বছর বয়সেÍ সেই পিরেতটা তাকে ঝগড়া করিয়েছে। লড়াই করিয়েছে। [১৭]

হবু সর্দার সোনা মাঝি গুরু কমল মাঝিকে না জানিয়ে একটি বিবাদ মীমাংসা করতে গেলে কমল মাঝি এসে মারামারি শুরু করে। সারা জীবন যে এই সব খারাপ রিপু থেকে সবাইকে দূরে থাকতে বলেছে, বৃদ্ধবয়সে সে তারই কাছে আত্মসমর্পণ করল।

সাপুড়ের গল্প

(তরুণের স্বপ্ন, ১৩৬৫)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সাপুড়ে শ্রেণী বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন ভাবে উঠে এসেছে। 'নারী ও নাগিনী' 'বেদের মেয়ে', 'বরমলাগের মাঠ' এই সব গল্পে সাপুড়ের প্রসঙ্গ রয়েছে। 'সাপুড়ের গল্প'-টিতে তারাশঙ্কর সাপুড়েদের জীবনাচরণ তুলে ধরেছেন :

> সাপ নিয়ে যারা কারবার করে তারাই সাপুড়ে। সাপ নিয়ে কারবার অনেকেই করে– বামুন, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ প্রভৃতি। নবশাকদের মধ্যে অনেকেই করে। ও কারবারের যেন একটা নেশা আছে ! এবং ঐ নেশায় নেশাখোরের যে চেহারা দাঁড়ায় সেটা বন্য বা বাউণ্ডুলে। গাঁজা খায়, মদ খায়, ঘর-সংসারে মন বসে না; এক কথায় ক্ষেপে ওঠে, আবার ভালবাসলে প্রাণ ঢেলে দিয়ে গ্রীষ্মের জলহীন নদীর মত হা হা করে। খাঁটি এবং খাস সাপুড়ে জাতের যারা তাদের তো কথাই নাই। খাল-বিলের কাছে–পতিত প্রান্তরে সেই আরণ্যযুগের ঘরদুয়ারে বাস করে; খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, নাচ-গান, ভিতর-বাহির দেহ মনও তাইÍ সে আদিম এবং আরণ্য। চেহারায় পর্যন্ত সেই ছাপ। পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে মানুষের মনে দেহে কত না পালটা পালটি কত না চাঁছাই-ছোলাই হয়েছেÍ কিন্তু ওদের হয়নি। দেহের মিশমিশে কালো রঙে, করকরে ঘন চুলে, নাক মুখ চোখের গড়নে সে সত্য দিনের আলোয় কালো সাপের মত স্পষ্ট। গ্রামে আসে, ভিক্ষে করে, সাপ নাচায়Í মানুষের সঙ্গে হাসি-খুশিতে বাঁশির সুরে সাপের হেলে দুলে নাচার মতো মনোরম ভঙ্গিতে মন রেখে কথা বলে, আবার খোঁচা খেলেই ছপ করে ছোবল মারতে চেষ্টা করে এবং দিনের বেলা ক্ষুধার জ্বালায় বেরিয়ে পড়ে সাপের মতো। যত শিগগির পারে ভিক্ষের ঝুলি বোঝাই করে গ্রাম থেকে বেরিয়ে চলে যায় ডেরার দিকে। ডেরা ওরা ঘরের ভিতরে কিছুতেই বাঁধবে না। বাঁধবে বাইরে হয় আম বাগানে, নয় বটতলায়। [১৮]

এভাবে সাপুড়ের জীবনচিত্র লেখক তুলে ধরেছেন এই গল্পে। কালী নামের এক বেদেনীর জীবন এখানে উন্মোচিত। সাপের পুংলিঙ্গবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'সাপা' শব্দটি। 'নারী ও

নাগিনী'র খোঁড়া শেখ যেমন সাপকে বিবি বলত তেমনি কালীও তার পোষা সাপ জোয়ান গোখুরাকে ভালবাসে। তার ভালবাসার নমুনা এরকম :

> অ কালীনাগ ! তুমি নাগ হইলে ক্যান? নাগর হইলে না? অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া অঙ্গ জুড়াইতাম। তুমি নাগ হইলা ক্যানে? কালীনাগ? সাপের ঝাঁপিটার উপর কাপড় পাট করে রেখে ঘুমায়। এ সাপটার উপর বহুজনের হিংসে। বিশ্বাস নেই। [১৯]

কালীর এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে নতুন রূপের বেদেনীকে আবিষ্কার করে পাঠক। 'নারী ও নাগিনী'র খোঁড়া শেখ যেমন একটি সাপকে বিবি বলে সম্বোধন করে, কালীও তেমনি পুরুষের চেয়ে পুরুষ সাপই বেশি পছন্দ করে। বিরাট আকারের সাপা অর্থাৎ পুরুষ সাপ কালীর খুব প্রিয়। সন্ন্যাসী যখন সাপাকে মেরে ফেলল তখন কালীর হৃদয়ে বেদনার ঝড় উঠেছিল যেন তার প্রেমিক হারিয়ে গেল। সন্ন্যাসী সাপার সঙ্গে লড়াই করে তাকে মেরে কালীকে জয় করে প্রতিজ্ঞা করল যে উড়িষ্যায় গিয়ে শঙ্খচূড় সাপা ধরে দেবে। কালী সন্ন্যাসীর সঙ্গে উড়িষ্যার চলে গেল। সেখানে শঙ্খচূড় সাপ পেয়েও মন ভরল না তার। শঙ্খচূড় সাপটির মধ্যে কালী তার গোখরা সাপাকে খুঁজে পেলনা। সাপাকে হত্যা করার প্রতিশোধ নিল সন্ন্যাসীকে হত্যা করে। তার প্রেমিক সন্ন্যাসীকে সে সাপের বিষ মুখে ঢেলে হত্যা করে এবং শঙ্খচূড় সাপটাকেও মেরে ফেলে সন্ন্যাসীর সেই গন্ধ ওঠা ওষুধ দিয়ে। তারপর কালী সেখান থেকে চলে যায়।

একটি প্রেমের গল্প

(অমৃত, পূজাসংখ্যা ১৩৭১)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় বঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর জীবনের গল্প বলেছেন তাঁর ছোটগল্পে। সাঁওতাল-জীবনের ছবি 'কমল মাঝির গল্প'তে দেখা যায়। গল্পকার এই গল্পে সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন। 'একটি প্রেমের গল্প' সাঁওতালদের সমাজজীবনের সাধারণ একটি গল্প। সাঁওতালদের জীবনের কিছু দিক যেমন বিয়ের পর ছেলেরা কিছুদিন শ্বশুর বাড়িতে থাকে, বিবাহিত যুগলদেরই যৌথ শ্রমের অধিকার, বিয়েতে মেয়েদের মতামতের প্রাধান্যÍ এসব বৈশিষ্ট্য এগল্পে রয়েছে। সাঁওতাল পাড়ার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন দক্ষতার সঙ্গে :

> এখানকার সাঁওতাল পাড়াটি খুব বড়। একশো সওয়া শো ঘর সাঁওতালের বাস। এবং অনেক কাল– অন্তত ষাট বছর ধরে এখানে তারা বাস করছে। আগে একজন

> সর্দারের অধীনে তারা বাস করত। বুড়ো মেঘলাল সর্দার ছিল প্রায় সাড়ে ছ ফুট লম্বা হিলহিলে রোগা। কিন্তু দুর্ধর্ষ সর্দার। এখন এক শো সওয়া শো ঘরেÍ তিন চারটি পাড়ায় তিন–চারজন সর্দার। এখানে এখন চারটে রাইস্ মিল, তা ছাড়া দেশের স্বাধীনতার পর অনেক কাজ হচ্ছে। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, ক্যানেলÍ তার জন্যে সাঁওতাল পাড়াটা জমে উঠেছে। এটা ছাড়াও আধ মাইল তফাতে একটা ছোট পাড়া বসেছেÍ মাইল খানেক দক্ষিণ পশ্চিমে আর একটা পুরনো পাড়া আছে। তাছাড়াও তিন-চার মাইলের মধ্যে আরও আট দশটা।
>
> এই বড় সাঁওতাল পল্লীতেই পশ্চিম পাড়ায় ফুলমণিদের পল্লীতে ফুলমণির বাবা ছিল চাষী সাঁওতাল। বাড়িতে দুটো বলদ ছিলÍ গৃহস্থের কাছে জমি ভাগে নিয়ে চাষ করত। ফুলমণির মা চাষে খাটত স্বামীর সঙ্গে। [২০]

ফুলমণি ঘটনাক্রমে দিনমজুর থেকে হয়ে যায় নার্স। নতুন যুগের সঙ্গে আদিবাসীদের জীবনকে যুক্ত করতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর। প্রসঙ্গক্রমে ফুলমণির সঙ্গে বুবনের প্রেমের কাহিনী এসেছে। বেহিসেবী প্রেমের ছবিও এসেছে, না পাওয়া প্রেমও রয়েছে। আবার সাঁওতালদের যৌথ শিকার উৎসবের বর্ণনা দিয়ে গল্পকার এই শিকারের পদ্ধতিকে 'অদ্ভুত' বলেছেন। কোপাই নদীর তীরবর্তী যে জঙ্গল রয়েছে সেই জায়গায় নদীর একটি বাঁক রয়েছে। বড় অর্জুন গাছ আর ছোট অর্জুন গাছ নিয়ে ওখানকার জঙ্গল। সেই জঙ্গলে শিকারের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়:

> মাঝিরা শিকার করতে করতে চলে গিয়েছিল উপরের দিকে। পেয়েছিল অনেক শিকার। খরগোশ গোটা-কতক, আর বনবিড়াল অনেকগুলো। এ বেটারা গাছে উঠে বাসা নিয়েছিল বানের সময়। জঙ্গলেই বাসা, জল ঢুকতেই গাছে চড়ে বসেছিল। বনবিড়ালগুলো ঘরের বিড়ালের চেয়ে বড়Í আকারে ডবল আর রঙ লালচেÍ তার মধ্যে গায় লাল ডোরা দাগ। নীচেটা এখনও কাদা ভিজে সপসপে, বেটারা এখনও ডালেই আছে। পাখি ধরে খেয়ে বলতে গেলে বেশ আছে। সাঁওতালেরা কাঁড় দিয়ে বিঁধে মেরেছে। আর মেরেছে কয়েকটা গোসাপ। [২১]

তারাশঙ্কর সাঁওতাল-জীবনের বাস্তব চিত্র এভাবেই অঙ্কন করেছেন এই গল্পে।

'যাদুকরের মৃত্যু'

'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পটির প্রথম প্রকাশকাল ও স্থান জানা যায়নি। বেদের মেয়ে, সাপ ধরা প্রভৃতি বেদেদের নিত্যদিনের প্রসঙ্গ এই গল্পে উঠে এসেছে। কুসুমপুরের ওস্তাদ নাদের শেখ নামের এক

বিখ্যাত গুনীন হল সাপুড়ে এবং সাপের দংশনে আহতদের চিকিৎসাও সে করে। মারণ উচাটন বশীকরণের বিদ্যা তার জানা। ডাইনীর গতিবিধি, ডাকিনী-বিদ্যা, কোন গাছ কী কারণে মারা গেল এসবও তার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নাদেরের মুখে এরকম অদ্ভুত বিদ্যার কথা শোনা যায়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নাদেরের গ্রামে প্রবেশ করার মুখে যে গাছটা দেখা যায় সেটা কাঁউরের গাছ, দেশজ গাছ নয়। এক ডাকিনী ঐ গাছ উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামের রমজান ওস্তাদ সেই গাছ নামিয়ে ফেলেছিল। তারপর সেই নারী-রূপী ডাকিনী রমজান ওস্তাদের পায়ের দিক থেকে মাথা পর্যন্ত চামড়া খুলে নেয়। এরকম নানা রকম মন্ত্র বা বিদ্যার কথা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। মানুষকে মন্ত্র পড়ে জানোয়ার বানিয়ে দিতে পারত কেউ কেউÍ নাদেরের কথা থেকে এই তথ্যও পাওয়া যায়। গ্রাম্য বেদেনী আর নাদের মন্ত্রমাখা ধূলো ছুড়ে পরস্পরের প্রতি যে আক্রমণ করেছে, সেটাও একটা ধোঁকা, মৌমাছি ধরে নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এক পর্যায়ে এক ডাক্তার তাকে ধরিয়ে দিল তার সব মন্ত্র ফাঁকি। সাপুড়ে, বেদেনী এরা ফাঁকি দিয়ে বেড়ায়। বুকের সাহস, হাতের কসরত এগুলো দিয়েই সাপ ধরা যায়, মন্ত্র দিয়ে নয়। ডাক্তার তাকে সব বুঝিয়ে দেয়ার পর সে ভেঙে পড়ল :

> নাদেরের ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল, সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমার আর কি রইল বাবু? সব যে হারিয়ে গেল ! [২২]

এভাবে বিজ্ঞানচিন্তার কাছে পরাভূত হল মন্ত্রতন্ত্রের তথাকথিত শক্তি। কিন্তু নাদেরের সমগ্র জীবনের বিশ্বাসভঙ্গের ট্রাজেডি অর্থাৎ যাদুকরের মৃত্যু ছুঁয়ে গেল পাঠকহৃদয়।

সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদের আলোচিত গল্পসমূহে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাঢ় বাংলার লোকজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে সুচারুভাবে। একই পেশাগত শ্রেণী বিভিন্ন গল্পে থাকলেও গল্পকারের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কারণে একই শ্রেণীর বিভিন্ন চরিত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাঢ় বাংলার লোকজীবনের বিভিন্ন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের পেশা ও জীবনাচরণ বাস্তবসম্মত রূপ নিয়ে তারাশঙ্করের গল্পে সমুজ্জ্বল। এই বাস্তব- সম্মত রূপের পর্যালোচনা রয়েছে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

তথ্যপঞ্জি ঃ

১. 'কামধেনু', *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড)*, সম্পাদক: অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০০০) পৃ ৬

২. 'কামধেনু', প্রাগুক্ত, পৃ ৭

৩. 'কামধেনু', প্রাগুক্ত, পৃ ৭

৪. 'পাটনী', প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

৫. 'পাটনী', প্রাগুক্ত, পৃ ২৮

৬. 'পাটনী', প্রাগুক্ত, পৃ ২৯

৭. 'বেদের মেয়ে', প্রাগুক্ত, পৃ ৯২

৮. 'রাঢ়ের বৈষ্ণবজীবন ও তারাশঙ্কর', *তারাশঙ্কর : আলোকিত দিগ্বলয়*, সম্পাদক: পল্লব সেনগুপ্ত (কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৭) পৃষ্ঠা ৭৬

৯. 'বাঞ্ছাপূরণ', প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭

১০. 'বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা', প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫

১১. 'বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা', প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫

১২. 'প্রহ্লাদের কালী', প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৮

১৩. 'বরমলাগের মাঠ', প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯-১৮০

১৪. 'বরমলাগের মাঠ', প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪

১৫. 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলী', প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৪

১৬. 'কমল মাঝির গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৯

১৭. 'কমল মাঝির গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ ৩২০

১৮. 'সাপুড়ের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬০

১৯. 'সাপুড়ের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬১

২০. 'একটি প্রেমের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬১-৪৬২

২১. 'একটি প্রেমের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৭

২২. 'যাদুকরের মৃত্যু', প্রাগুক্ত, পৃ ৮২৯

উপসংহার

বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উজ্জ্বল, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও মেধার কারণে এক স্মরণীয় নাম। সহস্র ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন সমৃদ্ধ। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি গগনচুম্বী, ছোটগল্পের সৃজনভূমিতেও তাঁর প্রতিভার অসাধারণ দ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে। পারিবারিক আদর্শ এবং জন্মভূমির প্রতি তীব্র আকর্ষণÍ এই দুই মিলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজগৎ পরিশীলিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প রচনা নির্দিষ্ট কালসীমায় চিহ্নিত করা গেলেও গল্পের বিষয় ও শিল্পগুণে তাঁর আবেদন চিরকালীন। পুরোনো কালের প্রতিধ্বনি এবং নতুন কালের আহ্বান বুকে লালন করে তিনি সাহিত্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তারই ফলস্বরূপ একাল এবং সেকাল সহাবস্থান করেছে তাঁর সাহিত্যে তথা ছোটগল্পে। তারাশঙ্করের সামগ্রিক গল্পসত্তার মূল ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্য থেকে উৎসারিত হয়েছে। মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে গল্পরচনায়। কল্লোলের কালের লেখক হয়েও কল্লোলীয় চেতনা থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন তিনি। তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্যের পাশাপাশি নিজ জন্মভূমি রাঢ় বাংলার লাভপুর গ্রামের প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং দরদ অনুভব করেছেন। রাঢ় বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে বাল্যকাল থেকে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় গল্পরচনার সময় বিষয় হিসেবে এই লোকজীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্র এবং উঠতি ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বও লাভপুরের মাটিতেই তিনি পেয়েছিলেন।

"তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় 'রাঢ় বাংলা এবং তারাশঙ্কর'-এর প্রথম পরিচ্ছেদ 'ছোটগল্পের ভুবনে তারশঙ্কর' অংশে ছোটগল্পক্ষেত্রে সমকালীন অন্যান্য গল্পকারদের পাশাপাশি তারাশঙ্করের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে রাঢ় বাংলার সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পৃক্ততা। রাঢ় বাংলার বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীকে লেখক বাস্তবে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন ঠিক সেভাবেই তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন। স্বর্ণ ডাইনী, রাধিকা বেদেনী, দ্বিজপদ পটুয়া এদের তারাশঙ্কর ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। দ্বিজপদ পটুয়া আর রাধিকা বেদেনীর সঙ্গে হৃদ্যতাও ছিল লেখকের। বাজিকর মেয়ের মুখে শোনা গানই তিনি তাঁর গল্পে ব্যবহার করেছেন। দেশি বেদিয়া সাপুড়ে, বর্বর-হিংস্র বেদে, সভ্য বেদে, যাযাবর ইরানি, বাজিকর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকজনকে তারাশঙ্কর একেবারে বাস্তবানুগভাবে চিত্রিত করেছেন। এসব

গোষ্ঠীর মুখের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ সবই বাস্তব–অনুসারী। লাঠিয়াল, মানষুড়েÍ এদের লেখক তাঁর কালে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি এদের কাছে জীবনের অনেক গল্প শুনেছেন। হরিজন, বাউরি শ্রেণীর কিছু লোকের সঙ্গেও ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল লেখকের। এত সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারণে তারাশঙ্কর রাঢ় বাংলার লোকজীবনকে নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'রাঢ় বাংলার লোকজীবন'-এ রাঢ় বাংলার বিভিন্ন লোকসম্প্রদায়, যেমন-হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগ্‌দি, ভল্লা, বেদে, সাপুড়ে, মাঝি, কৃষক, গোপ, সদ্‌গোপ, বোষ্টম, বাউল প্রভৃতি শ্রেণীর পরিচয়, শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য, পেশা, জীবনাচরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় "তারাশঙ্করের ছোটগল্পে লোকজীবনের রূপায়ণ"। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখকের প্রথম পর্যায়ের (১৩৩৪-১৩৪৩) ছোটগল্পে লোকজীবন রূপায়ণের চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ-পর্যায়ে লোকজীবন ভিত্তিক গল্পের সংখ্যা বেশি। গ্রামীণ পটভূমি প্রথম দিকের গল্পগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে। এসব গল্পে রাঢ়ের গ্রামীণ সমাজের জমিদারতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে; কিন্তু এই অভিসন্দর্ভে শুধুমাত্র লোকজীবন-সম্বলিত গল্পসমূহের আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৩৪৪-১৩৫৩) ছোটগল্পগুলোতে যেখানে লোকজীবনের প্রকাশ ব্যাপক সেই গল্পগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের (১৩৫৩-১৩৭৭) ছোটগল্পগুলোর অধিকাংশের পটভূমি শহর অথবা লোকজীবনবহির্ভূত গ্রামীণ পটভূমি। এ-পর্যায়ের ছোটগল্পগুলোর মধ্যে লোকজীবন প্রস্ফুটিত হয়েছে এমন রচনা তৃতীয় পরিচ্ছেদে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাঢ় বাংলার লোক গোষ্ঠীর পেশা, জীবনধারা, খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, উৎসব-অনুষ্ঠানের চিত্র উঠে এসেছে। জাত-বৈষ্ণব ও ভেকধারী বৈষ্ণব এবং গৃহী ও আখড়াধারী বৈষ্ণবের মধ্যে আচরণগত পার্থক্য বৈষ্ণবতা-আশ্রয়ী গল্পগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। বেদে শ্রেণীকে তারাশঙ্কর তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে উপস্থাপন করেছেন। সাপুড়ে, সাপের ওঝা, বেদে, বাজিকর, যাদুকর শ্রেণীর রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন প্রকার বেদে সম্প্রদায়ের সাপ ধরার কৌশল, জীবিকানির্বাহের পদ্ধতি, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি এই অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া অন্ধ-কুসংস্কারের কারণে কিছু নারীর ডাইনী হয়ে ওঠার কাহিনী এবং এই ডাইনী-রূপী নারীদের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা, সুখ-দুঃখ, মনোজগৎ আলোচিত হয়েছে। এসব শ্রেণী ছাড়াও কৃষক, মাঝি, পটুয়া, মালাকার, সন্ন্যাসী, ভিখারী, চোর, ডাকাত, সাঁওতাল শ্রেণীর জীবন ও জীবিকা এবং জীবন-সংশ্লিষ্ট আচরণ উন্মোচিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের বৈচিত্র্যপ্রকাশে রাঢ় বাংলার লোকজীবন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জীবনের সংকীর্ণ বৃত্ত তিনি রচনা করেননি, প্রসারিত–অবারিত জীবনের হাতছানি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। কল্লোলের কালের লেখক হয়েও কল্লোলের থেকে ভিন্ন মনোভাব নিয়ে তিনি গল্প রচনায় উৎসাহী হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তারাশঙ্করের ছোটগল্পের ভাণ্ডারে রয়েছে লোকজীবনের এক জীবন্ত দলিল। তাঁর ছোটগল্পপাঠে পাঠক আজও রাঢ় বাংলার বিস্তৃত জনজীবন উপলব্ধি করতে পারেন। অর্ন্তভেদী ও সৃষ্টিশীল শিল্পিসত্তা-সমৃদ্ধ গল্পগুলো রাঢ় বাংলাকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করে নতুন এক অভিজ্ঞতার স্বাদ এনে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূল গ্রন্থ

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক: অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৮)

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক: অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, সপ্তম মুদ্রণ, ২০০০)

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক: অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০০)

সহায়ক গ্রন্থ

ক. তারাশঙ্করের অন্যান্য রচনা

তারাশঙ্কর রচনাবলী, *তৃতীয় খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৮৭)

তারাশঙ্কর রচনাবলী, *ষষ্ঠ খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯২)

তারাশঙ্কর রচনাবলী, *সপ্তম খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, দ্বিতীয় মুদ্রণ, চৈত্র ১৩৮৯)

তারাশঙ্কর রচনাবলী, *অষ্টম খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮১)

তারাশঙ্কর রচনাবলী, *দশম খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কার্তিক ১৩৮৮)

আমার সাহিত্য জীবন, দুই খণ্ড একত্রে (পশ্চিমবঙ্গ: ১৯৯৭)

খ. তারাশঙ্কর বিষয়ক সহায়ক গ্রন্থ

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য* (কলকাতা: ১৩৮৪)

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : *যুগলবন্দী গল্পকার: তারাশঙ্কর মানিক* (কলকাতা: ১৯৯৪)

(সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে* (কলকাতা: ১৯৯৯)

নিতাই বসু : *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস* (কলকাতা: ১৯৮৮)

পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর : আলোকিত দিগ্বলয়* (কলকাতা: ১৪০৭)

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : *ছোটগল্পে ত্রয়ী: তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিক* (কলকাতা: ১৯৮৫)

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)

: *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদিত) (ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১

মো: সেলিম ভূঞা : *তারাশঙ্করের উপন্যাস: কৌম জীবনের রূপায়ণ* (ঢাকা: ২০১০)

মিল্টন বিশ্বাস : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ* (ঢাকা: ২০০৯)

রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় : *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা* (কলকাতা : ১৯৮৭)

শান্তনু পাল : *তারাশঙ্করের ছোটগল্প: বিষয় ও আঙ্গিকরীতি* (কলকাতা: ২০১১)

সফিকুন্নবী সামাদী : *তারাশঙ্করের ছোটগল্প: জীবনের শিল্পিত সত্য* (ঢাকা: ২০০৪)

সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক : *তারাশঙ্কর: জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা: ১৯৮৯)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ* (কলকাতা: ২০০৩)

: *তারাশঙ্কর অন্বেষা* (সম্পাদিত) (কলকাতা: ১৯৮৭)

গ. তারাশঙ্কর বিষয়ক প্রবন্ধ

আশুতোষ ভট্টাচার্য : "তারাশঙ্কর ও রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি", *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)

উদয়চাঁদ দাস : "কথাসাহিত্যে সমাজতত্ত্ব: তারাশঙ্কর", *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সংকলক ও সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)

করুণাসিন্ধু দাস : "তারাশঙ্করের বাকশিল্প: উপাত্ত এবং নির্মাণে", *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় : "'নারী ও নাগিনী': বাসনার বিষম ত্রিভুজ", *যুগলবন্দী গল্পকার: তারাশঙ্কর মানিক*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৪)

কাননবিহারী গোস্বামী : "রাঢ়ের বৈষ্ণব জীবন ও তারাশঙ্কর", *তারাশঙ্কর: আলোকিত দিগ্বলয়*, সম্পাদক: পল্লব সেনগুপ্ত (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৭)

ক্ষেত্র গুপ্ত : "তারাশঙ্কর'৯৮", *তারাশঙ্কর: আলোকিত দিগ্বলয়*, সম্পাদক: পল্লব সেনগুপ্ত (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৭)

দিব্যজ্যোতি মজুমদার : "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনী': মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ", *যুগলবন্দী গল্পকার: তারাশঙ্কর মানিক*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৪)

দীপক চন্দ্র : "তারাশঙ্করের গল্পে জীবন ও প্রকৃতি", *তারাশঙ্কর: দেশ কাল সাহিত্য*, সম্পাদক: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (কলকাতা: প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

দীপক মুখোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের সাহিত্যে লোকসমাজ: নৃতাত্ত্বিক পরিচয়",

তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে, সংকলক ও সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)

দেবলীনা শেঠ : "তারাশঙ্করের ডাইনীরা", *তারাশঙ্কর: আলোকিত দিগ্বলয়*, সম্পাদক: পল্লব সেনগুপ্ত (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৭)

দেবাশিস মুখোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে বাস্তবের নরনারী", *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সংকলক ও সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী': নিয়তির নিমর্ম অনিবার্যতা", *যুগলবন্দী গল্পকার: তারাশঙ্কর মানিক*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৪)

পল্লব সেনগুপ্ত : "সাহিত্যিক-নৃতত্ত্ব ও তারাশঙ্কর", *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সংকলক ও সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)

বরুণকুমার চক্রবর্তী : "তারাশঙ্কর: আচার-ধর্ম ও সংস্কার", *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সংকলক ও সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)

বিনয় ঘোষ : "তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ", *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)

বিশ্বজিৎ ঘোষ : "ছোটগল্পের শিল্পরূপ: তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি'", *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদক: ভীষ্মদেব চৌধুরী (ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, ২০০১)

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : "জলসাঘর: নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব" *যুগলবন্দী গল্পকার: তারাশঙ্কর মানিক*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪)

: "তারাশঙ্কর: দেশ ও কাল", *তারাশঙ্কর: আলোকিত দিগ্বলয়*, সম্পাদক: পল্লব সেনগুপ্ত (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৭)

বিশ্বনাথ রায় : "তারিণী কথা: গল্পের জীবন জীবনের গল্প", *যুগলবন্দী গল্পকার: তারাশঙ্কর মানিক*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪)

মিতালী মুখোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য) : "ভাষাশিল্পী তারাশঙ্কর", *তারাশঙ্কর: আলোকিত দিগ্বলয়*, সম্পাদক: পল্লব সেনগুপ্ত (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৭)

মীনাক্ষী সিংহ : "তারাশঙ্করের সাহিত্যে সমাজচেতনা", *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সংকলক ও সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)

রবিন পাল : "তারাশঙ্কর ও তাঁর গল্প", *তারাশঙ্কর: দেশ কাল সাহিত্য*, সম্পাদক: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (কলকাতা: প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

রামকুমার মুখোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের 'পৌষ-লক্ষ্মী': ভিন্ন এক পাঠরীতির সন্ধানে", *যুগলবন্দী গল্পকার, তারাশঙ্কর মানিক*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪)

শক্তিপদ রাজগুরু : "লালমাটির মানুষ", *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪)

শতদ্রুশোভন চক্রবর্তী : "কড়িমাধ্যমের বিস্তার: তারাশঙ্করের ডাইনী", *যুগলবন্দী গল্পকার: তারশঙ্কর মানিক*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৪)

শম্পা সরকার : "তারাশঙ্করের গান", *তারাশঙ্কর: আলোকিত দিগ্বলয়*, সম্পাদক: পল্লব সেনগুপ্ত (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৭)

শুভঙ্কর ঘোষ : "তারাশঙ্করের ছোটগল্প ও 'কালাপাহাড়'", *যুগলবন্দী গল্পকার: তারাশঙ্কর মানিক*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, (কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৪)

সিরাজুল ইসলাম : "তারাশঙ্করের 'রসকলি': দ্বন্দ্ব ও মীমাংসা", *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদক: ভীষ্মদেব চৌধুরী (ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, ২০০১)

ঘ. সহায়ক অন্যান্য গ্রন্থ

অতুল সুর : *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়* (কলকাতা: সাহিত্যলোক, জুলাই ১৯৮৮)

অনীক মাহমুদ : *আধুনিক সাহিত্য: পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের প্রতিমা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯)

: *কালের পুত্তলিকা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৯)

আহমদ শরীফ (সম্পাদক) : *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯২)

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮)

এটি এম কামরুল ইসলাম : *আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকসংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষা: বৈচিত্র্যে ও ব্যঞ্জনায়* (ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১১)

ওয়াকিল আহমদ : *বাংলার লোক-সংস্কৃতি* (ঢাকা: ভাদ্র ১৩৮১)

: *লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ* (ঢাকা: বইপত্র, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৭)

গোপাল হালদার : *সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৪)

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য* (কলকাতা:

দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)

: *বাংলা কথাসাহিত্য: প্রকরণ ও প্রবণতা* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯১)

গোলাম মুরশিদ : *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১০)

জগদীশ ভট্টাচার্য : *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী* (কলকাতা: ১৯৯৪)

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : *শাক্ত পদাবলী* (কলকাতা: রত্নাবলী, পঞ্চম মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৯৭)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *সাহিত্যে ছোটগল্প* (কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরি, ১৩৬৯)

নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, ১৩৮৬)

বিনয় ঘোষ : *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড* (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, সপ্তম মুদ্রণ, মার্চ ২০১০)

: *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮)

: *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড* (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, পঞ্চম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৯)

: *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, চতুর্থ খণ্ড* (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭)

: *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৯)

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০২)

বীরেন্দ্র দত্ত : *কবি ও কথাকার* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৯)

: *বাংলা কথাসাহিত্যের একাল (১৯৪৫-১৯৯৮)* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৮)

: *বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, মে ২০০০)

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *জগদীশ গুপ্তের গল্প: পঙ্ক ও পঙ্কজ* (ঢাকা: ফুলদল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮)

ভূদেব চৌধুরী : *ছোটগল্পের কথা* (পশ্চিমবঙ্গ: ২০০০)

: *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার* (কলকাতা: পঞ্চম প্রকাশ, ২০০৩)

রফিকউল্লাহ খান : *কবিতা ও সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

: *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

: *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা: অন্যন্যা, ২০০২)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড* (কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী, পুনরমুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৭১)

: *লোকসাহিত্য* (কলকাতা: পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৫২)

শিব শংকর ঘোষ : *পুরাতত্ত্ব কৃষ্টি ও সামাজিক বিবর্তনে রাঢ়ের গোপভূম* (কলকাতা: প্রভা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৬)

শিশিরকুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩-১৯২৩)* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫)

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলক) : *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলকাতা: চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৬)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (কলকাতা: পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৭১)

সাইফুল ইসলাম : *সংস্কৃতি ও উন্নয়ন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: এপ্রিল ২০০৯)

সাঈদ-উর-রহমান : *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি

২০০১)

সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক) ও সাজাহান মিয়া (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) : *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খণ্ড ১ (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩)

: *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খণ্ড ২ (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩)

: *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খণ্ড ৩ (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩)

: *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খণ্ড ৪ (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩)

: *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খণ্ড ৫ (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩)

: *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খণ্ড ৬ (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩)

: *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খণ্ড ৭ (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩)

: *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খণ্ড ৮ (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩)

: *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খণ্ড ৯ (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ

২০০৩)

: *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, *খণ্ড ১০* (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩)

সেলিনা হোসেন (সম্পাদক) ও নূরুল ইসলাম : *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭)

সৈয়দ আকরম হোসেন : *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য* (ঢাকা: ১৯৯৭)

: *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

সৈয়দ আজিজুল হক : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ* (ঢাকা: ১৯৯৮)

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : *ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৯৫)